প্রথম প্রকাশন : জানুয়ারী, ১৯৪৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৪৭

দাম : এক টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

সূচীপত্র



নবাব মীরকাশেম
স্বাধীন বাংলা

খুব বেশী দিনের কথা নয়, তোমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা যখন পাততাড়ি বগলে পাঠশালে গিয়ে সারি বেঁধে চ্যাটাই পেতে ব'সে যেতেন, আর ধূলোর বস্তা খুলে দিয়ে ধূলোর ওপর "ক খ গ" লিখ্‌তে সুরু ক'রে দিতেন, সেই পুরাতন দিনের কথা ব'ল্‌ছি। দুশ' বছর হতে এখনও বাকী আছে। তখনও বাঙলা ছিল স্বাধীন। আজ কালকার বিরাট ক'লকাতা শহর সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যার স্থান হ'চ্ছে দ্বিতীয়, আর যেখানে এখন ৪০ লাখ লোক বাস করে, তা তখন ছিল একটা গণ্ড গ্রাম—কে-ই বা তার খোঁজ রাখ্‌ত আর কে-ই বা তার নাম জান্‌ত? তখন মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মুংগের, পাটনা ছিল নামজাদা শহর। তখন বাঙলা-বিহার ছিল একটা প্রদেশ।

তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাব ছিলেন দেশের হর্তা-কর্তা, তিনি দরবারী পোষাক হীরা জহরৎ প'রে নবাবী মসনদে ব'সতেন। আর সেনাপতি, মন্ত্রী, সামন্ত রাজা, কাজী, ফৌজদার, সেপাই লস্করে তাঁর সভা গম্‌গম্ ক'রত —তাঁদের কেউ বা হিন্দু কেউ বা মুসলমান। তখনকার দিনে রাজা ছিলেন দেশের লোক, বিদেশ থেকে এসে পকেট ভর্‌তি করে চলে যেতেন না। রাজা কখনও কখনও খামখেয়ালী করতেন, কিন্তু যোগ্যতার কদর করতেন। রাজা ছিলেন মুসলমান, কিন্তু হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক্, যোগ্যতা থাক্‌লে সব চেয়ে উঁচু কাজে বাহাল হ'তেন। এখনকার মত ধর্ম বা জাতির কথাটাই তখন দেশের কাজে সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না—অযোগ্যকে ধর্মের জন্য দায়িত্বপূর্ণ কাজে রাখতেই হবে, যোগ্যকে দূর করতে হবে, এরকম উদ্ভট ব্যবস্থা রাজ্যের নীতি বলে মানা হ'ত না। ইউরোপ থেকে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ বণিকরা তখন সবেমাত্র ব্যবসায় স্থুরু করেছে। সূতা, কাপড়, লবণ, সোরা—এই সব নিয়ে তারা ব্যবসা করে, আর দেশী কর্মচারীদের ধ'রে নবাবের সভায় গিয়ে নবাবকে কুর্নিশের উপর কুর্নিশ দেয়।

দেশে তখন অন্নের অভাব ছিল না। তখন টাকায় আড়াই মণ তিন মণ চা'ল পাওয়া যেত। গাওয়া ঘি'-এর মণ ছিল পাঁচ টাকা। ময়দার মণ ছিল আট আনা কি ন' আনা। খাজাঞ্চী গোমস্তাদের মাসিক বেতন ছিল পাঁচ টাকা। এই

সামান্য বেতনেও তাঁদের স্বচ্ছল ভাবে সংসার চলে যেত ; বার চাসে তের পার্বণ হ'ত—দোল দুর্গোৎসবও বাদ যেত না। গ্রাম্য যুবকরা মনের আনন্দে কাঁধে রঙীন গামছা দুলিয়ে, হাতে বুলবুল পাখী নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। এখনকার মত সকাল সন্ধ্যা চা'এর মজলিস বস্‌ত না বটে, তবে বৃদ্ধেরা মজলিস জমাতেন। রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা শোনবার জন্য আসরে ভিড় জমে যেত। পুরাণ, শাস্ত্র ছিল তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কখন কখন পরচর্চা যে তাঁরা না করতেন তা নয়, তবে তখনকার দিনে সংবাদ পত্রের প্রচলন হয় নি। অতএব টৌকিও, বার্লিনের নামগন্ধ গাঁয়ের লোকেরা জানত' না। গাঁয়ে গাঁয়ে ছিল পাঠশালা আর টোল। পুঁথি পড়তে আর সংস্কৃত শ্লোক দু'একটা আওড়াতে পারলেই যে কোন লোক পণ্ডিত বলে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন।

তখন না ছিল সিনেমা বায়স্কোপ, না ছিল ট্রেন ষ্টিমার। এরোপ্লেনের মত যন্ত্রের কল্পনা কার' মনকে স্পর্শ পর্যন্ত ক'রত না। গোরুর গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী ছিল স্থলপথের একমাত্র যান-বাহন। আর নৌকা ছিল এদেশের একমাত্র জলযান। টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো-পাখা একেবারে অজ্ঞাতই ছিল। তীর্থ করবার জন্য দূরদেশে যেতে হ'লে যাত্রীরা আত্মীয় স্বজনের কাছে বিদায় নিয়ে প্রাণের আশা, ঘরে ফিরবার আশা ছেড়ে দিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তবে বেরুতেন। বনে বাঘ, ভালুক—আর তা'দের চাইতেও বেশী হিংস্র চোর-দস্যু মানুষের

যাত্রাপথকে সব সময় ভীষণ বিপদ-সংকুল ক'রে রাখত'।

তবে সুখের বিষয়, বাঙালী তখনও কংকালসার অর্ধমৃত একটা পংগু জাতিতে পরিণত হয় নি। ম্যালেরিয়া, কলেরা, মহামারী তখনও বাঙ্লার পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করে নি। বাঙালীর বাহুতে ছিল শক্তি, বুকে ছিল তেজ, চোখে ছিল দিব্য জ্যোতিঃ, প্রাণে ছিল অদম্য আনন্দ-ভালবাসার উৎস। তারা তখন লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, তীর, হাতিয়ার চালাতে ছিল ওস্তাদ। গ্রামে ডাকাত প'ড়লে গ্রামবাসীরা দল বেঁধে ডাকাত তাড়াতে আগুয়ান হ'তে কুণ্ঠিত হত না। তাদের বর্শার খোঁচায় আর তীরের আঘাতে বহু ডাকাত দল নিশ্চিহ্ন হ'য়েছে। গৃহরক্ষার জন্য তা'দিগকে পুলিশের উর্দিধারী কন্স্টেবলের সাহায্য নিতে হ'ত না; তারা কুস্তি করতে, লড়াই করতে, ঘোড়ায় চ'ড়তে ছিল ওস্তাদের ওস্তাদ। দু'শ বছর আগেকার বাঙালীর সঙ্গে এ যুগের বাঙালীর আকাশ পাতাল তফাৎ।

তবে দুঃখের বিষয়, দেশের শাসকরা বেশীর ভাগ কোন কাজের ছিলেন না। তাদের অধিকাংশই আলস্যে ও বিলাসে সময় কাটাতেন। মারাঠা বর্গীরা এসে বাঙ্লাদেশে লুঠতরাজ ও নরহত্যা ক'রে, আর শস্য ও গৃহ জ্বালিয়ে নষ্ট ক'রে দেশে একটা বীভৎস অরাজকতা সৃষ্টি ক'রত। তা'দিগকে বাধা দেবার ক্ষমতা নবাবের ছিল না। মেদিনীপুর আর বর্ধমান অঞ্চল বর্গীর অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। তখন দেশে যদি যোগ্য রাজা থাকৃত, তাহলে লোকের সুখের সীমা

থাকত না। তখন নবাব বংশ ও নবাবের কর্মচারীদের মধ্যেই অবিরত ষড়যন্ত্র, খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি লেগে থাকত। যাঁদের গৃহে শান্তি নেই, তাঁরা রাজ্যে আর শান্তি রাখবেন কি ক'রে? প্রজারক্ষার আগেই তাঁরা আত্মরক্ষার কথা ভেবে আকুল হ'তেন।

মোটামুটি, তখন দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। লোকে সরল সুশৃঙ্খল জীবন যাপন ক'রতে পারত'। দেহের ও মনের শক্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু রাজশক্তি দুর্বল ছিল ব'লেই, বাইরের লুণ্ঠনকারীরা সুযোগ পেলেই বাঙ্‌লার দরজায় উঁকিঝুঁকি মারত'। তা'তেই মাঝে মাঝে অশান্তির আগুণ জ্বলে উঠত'— গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে প'ড়ত।





সিরাজদ্দৌলা

সিরাজদ্দৌলা ছিলেন বাঙ্‌লা-বিহারের শেষ স্বাধীন নবাব। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দি খাঁ মারা যান। তাঁরই দৌহিত্র সিরাজ দাদামশাইএর শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করেন। আমাদের দেশে সকলের বিশ্বাস—যে ছেলে দাদামশাই আর দিদিমার স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছে, সে ছেলে উচ্ছন্ন গিয়েছে। সিরাজের বেলায় হয়েছিল তাই। ছোট বেলা থেকে অত্যধিক আবদার পেয়ে তিনি হয়েছিলেন উদ্ধত, উচ্ছৃংখল আর বে-পরোয়া। নবাবের মসনদে ব'সে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রলেন। তাঁর অত্যাচারের ভয়ে দেশের লোকের মান বাঁচান দায় হল। যাঁকে সম্মান করে চলা উচিত, তাঁকে অপমানিত করতে তাঁর সংকোচ হত না। আলীবর্দি বৃদ্ধ বয়সে সিরাজকে রাজ্যশাসন ব্যাপারে হরেকরকম উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষতঃ মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ, মীরজাফর প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করে চলবার জন্য তাঁর উপদেশ ছিল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা, বিশেষতঃ ইংরেজরা যে নবাবের পরম শত্রুতাসাধন করতে

পারেন একথাও তিনি সিরাজকে বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন। এই শেষ কথাটি সিরাজের অন্তরে খানিকটা প্রবেশ করেছিল। কারণ, দেখা যায় ইংরেজদিগকে শায়েস্তা করবার জন্য তাঁর উৎসাহ কখনও কম ছিল না। অবশ্য এই কাজটি হাঁসিল করতে হলে নিজের রাজ্যের কর্ম্মচারী, সৈন্য-সামন্ত এবং প্রজাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু সিরাজের উদ্ধত, রুক্ষ প্রকৃতি আর চরিত্রহীনতার জন্য অধিকাংশ বড় বড় কর্মচারী ও রাজ্যের বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর উপর হাড়ে হাড়ে চটে ছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবেরা সকলেই শেঠদের পরামর্শ নিয়ে চল্‌তেন। তাঁরা ছিলেন বাঙ্‌লাদেশের সেরা ধনী। সিরাজের সময় মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ ছিলেন রাজ্যের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর গদিতে সব সময় দশ কোটি টাকার কারবার চল্‌ত। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী বণিকরা আর দেশীয় জমিদার, মহাজন, ব্যবসাদারেরা সবাইকে জগৎশেঠের বাড়ীতে টাকা কর্জ নেওয়ার জন্য ধন্না দিতে হ'ত। এজন্য সর্বত্র জগৎ-শেঠের যথেষ্ঠ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সিরাজদ্দৌলা একবার জগৎশেঠকে তিন কোটি টাকা বণিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে রাজকোষে জমা দিতে আদেশ দেন। জগৎশেঠ বণিক-দিগকে এই ভাবে পীড়ন ক'রতে অস্বীকার করেন। তখন উদ্ধত সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে শেঠ মশায়ের গণ্ডদেশে সজোরে চপেটাঘাত করেন; এবং তার পরেই তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ

করা হয়। এই ব্যাপারে মীরজাফর দৃঢ় প্রতিবাদ করেন ; আর শেঠকে কারামুক্ত ক'রতে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধও উপেক্ষিত হয়। তা' ছাড়া সিরাজ অন্যভাবে মীরজাফরের বিদ্বেষ জন্মিয়ে ছিলেন। মীরজাফর ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। অথচ সিরাজ মীরজাফরকে আদেশ দেন যে মোহনলালের আদেশ তাঁকে মান্য ক'রতে হবে, তাঁকে সম্মান দেখাতে হবে। মোহনলাল ছিলেন একজন নবীন মন্ত্রী। কাজেই এই আদেশ পেয়ে মীরজাফর অত্যন্ত রুষ্ট ও মর্মাহত হন।

এইভাবে চঞ্চলমতি সিরাজ রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে এইসব ব্যক্তিরাই রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ; এই স্তম্ভগুলি বিরূপ হ'লে তাঁর রাজ্য আর রাজসিংহাসন পথের ধূলিতে মিশে যাবে। এইখানেই সিরাজের ভ্রম আর অযোগ্যতা। রাজা দুর্লভরাম ও ইয়ার লতিফ খাঁ নামে দু'জন সেনাপতি সিরাজের উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়েছিলেন—ঐ একই কারণে। অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি কোন না কোন কারণে সিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সিরাজ সিংহাসনে বসার সংগে সংগেই তাঁর মাসীমা ঘেসেটী বেগমের সমস্ত ধনরত্ন মতিঝিল প্রাসাদ থেকে লুণ্ঠন করে নেন ও সংগে সংগে মাসীমাকে বন্দী করেন।

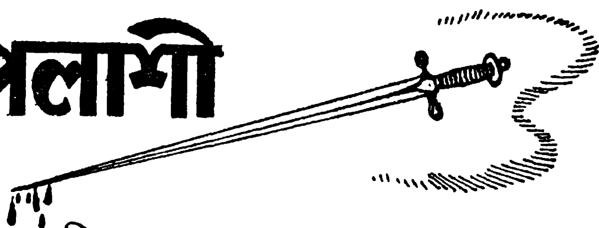
দিনে দিনে সিরাজের শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি হ'তে লাগল।

মীরজাফর, জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ খাঁ, খোজা পিদ্রু প্রভৃতি সুযোগ বুঝে ইংরেজের সংগে ষড়যন্ত্র আরম্ভ ক'রলেন। ছোট বড় মাঝারি নানা প্রকারেরর নরনারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেন। কলিকাতার বণিক উমিচাঁদ ইংরেজ পক্ষের সংগে কথাবার্তা চালাবার মধ্যস্থরূপে কাজ ক'রতে লাগলেন। ঘেসেটী বেগম পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে লাগলেন। ইংরেজেরা সিরাজের সংগে মুখে মিত্রতা রেখে ভিতরে ভিতরে কাশিমবাজারের কুটীতে ইংরেজ সৈন্য বাড়াতে লাগলেন—যুদ্ধের আয়োজন চল্‌তে লাগল। যথাসময়ে ষড়যন্ত্রকারীদের সংগে ইংরেজপক্ষের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'য়ে স্থির হ'ল—সিরাজের পতনের পর মীরজাফর হবেন নবাব। আর ইংরেজপক্ষ ও বণিকেরা পুরস্কার স্বরূপ রাশি রাশি ধনরত্ন পাবেন। ইংরেজ কোম্পানী ১ কোটী, ইউরোপীয় বণিকেরা ৫০ লক্ষ, দেশীয় বণিকেরা ২০ লক্ষ, আর্মানি বণিকেরা ৭ লক্ষ টাকা পাবেন। উমিচাঁদ দাবী ক'রলেন ৩০ লক্ষ টাকা। যে সাদা কাগজে সকলে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করলেন, তাতে উমিচাঁদের টাকার উল্লেখ থাকল না। উমিচাঁদকে সন্তুষ্ট ক'রবার জন্য ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইবের উর্বর মস্তিষ্কে এক বুদ্ধি গজিয়ে উঠ্‌ল। তাঁর আদেশক্রমে একটী লাল কাগজে জাল সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। তাতে লেখা হ'ল উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা পাবেন। এই লাল কাগজখানাই উমিচাঁদকে দেখান হইল। নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন জাল দলিলে স্বাক্ষর ক'রতে অস্বীকার

করায় ক্লাইবের আদেশে লুসিংটন সাহেব জাল সই ক'রলেন। এই ক্লাইবের নাম আজ ভারতের ইতিহাসের পাতায় সগৌরবে স্থান পায়। ষড়যন্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে পলাশীর যুদ্ধ, অর্থ-লুণ্ঠন প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে তাঁর কৌশলী হস্ত কাজ ক'রেছে।

এই প্রকারে তরুণ সিরাজের অজ্ঞাতসারে তাঁর মৃত্যুবাণ রচিত হ'ল। দেশের প্রবীণরা সিরাজের সর্বনাশ সাধনের জন্য অকাতরে ইংরেজকে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লেন। এর ফলে দেশের যে কি অভূতপূর্ব দুর্দশা আসতে পারে, সে কথা কেউ চিন্তা পর্যন্ত ক'র্‌লেন না। গোপনে, অতি সংগোপনে বাঙ্‌লা-বিহারের স্বাধীনতা বিক্রীত হ'য়ে গেল—মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়া হ'ল।

— — —



পলাশী

বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর

—নজরুল

মুর্শিদাবাদের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথী তীরে পলাশী গ্রাম। এই পলাশী প্রান্তরে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সিরাজের সংগে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। নবাবের পক্ষে ৫০ হাজার সৈন্য, অথচ ইংরেজপক্ষে মাত্র ৩ হাজার সৈন্য। এই যুদ্ধে নবাবের বীর সেনাপতি মীরমদন বীর বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে নিহত হন। বীর মোহনলাল যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। আর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, ইয়ার লতিফ খাঁ ও দুর্লভরামের সৈন্যদল একপার্শ্বে দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়েছিলেন। সকলে যদি সেদিন যুদ্ধ ক'রত, তা'হলে সেইদিনই অন্ততঃ বাঙ্‌লাদেশ থেকে ইংরেজের নাম লুপ্ত হ'য়ে যেত। অল্পক্ষণ যুদ্ধ ক'রেই ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব দেখলেন যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় অনিবার্য। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সৈন্যগণকে আমবাগানের আড়ালে আত্মগোপন করতে নির্দেশ দিলেন। একটা উঁচু বাঁধের আড়াল থেকে তাঁরা কয়েকটা কামান দাগতে লাগলেন। নবাব পক্ষে ফরাসী গোলন্দাজরা গোলা ছুঁড়ছিল। আর নবাব সৈন্য ক্রমে অগ্রসর হয়ে আসছিল। এইরকম অবস্থায় যে নবাবের পরাজয়

হয়েছে, সেটা কেবল অদৃষ্টের দোষ। অদৃষ্টের দোষই বা বলি কেন? সেটা একমাত্র নিজের সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। ইংরেজের গোলার আঘাতে মীরমদন নিহত হলেও পরাজয়ের কোন কারণ ছিল না। মোহনলাল অমিতবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে ইংরেজদিগকে প্রায় কাবু ক'রে এনেছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য সিরাজ তা' বুঝতে পারে নি। মীরমদনের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে প'ড়লেন, আর মীরজাফরকে ডেকে তাঁর পায়ের তলায় মুকুট রেখে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা ক'রলেন। মীরজাফরের কুমন্ত্রণায় ভুলে গিয়ে সিরাজ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিলেন। সে আদেশের কারণ বুঝতে না পেরে নবাব সৈন্য ছত্রভংগ হয়ে পালাতে লাগল। আর এই সুযোগে ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হয়ে নবাব সৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করে তা'দিগকে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রতে লাগল। এইখানেই পলাশী যুদ্ধের শেষ, আর বাঙালীর স্বাধীনতার সমাধি।

হায় পলাশী! তুমি কি ইতিহাসই না রচনা করেছ? আজ পলাশীর নামে বাঙালী হিন্দু-মুসলিমের প্রাণে আর্তনাদ ওঠে, নিজেদের উপর ধিক্কার জম্মে যায়। কি কুক্ষণে মীরজাফরের মত কুলাংগার বাঙ্‌লা মায়ের অংকে স্থান পেয়েছিল! মীরজাফরের দল পলাশীতে যে অপরাধ করে গিয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কত দিনে পূর্ণ হবে কে জানে? এই দু'শ বছরের ভিতর কত শত সহস্র ভারতীয় যুবক বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ভারত জননীর চরণ রাঙিয়ে দিয়েছে, তবু তাঁর পায়ের শৃংখল

খ'সে পড়ে নি। তবুও ত' মায়ের ম্লানমুখে হাসির রেখা ফুটে উঠে নি। আজও পলাশীর বুকে ইংরেজের জয়স্তম্ভ বাঙালীকে ধিক্কার দিচ্ছে।

সিরাজের শেষ দশা

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সিরাজ দেখলেন যে তাঁর সৈন্যরা ছত্রভংগ হয়ে রণস্থল ত্যাগ ক'রল, তিনিও তখন নিরুপায় হয়ে হাতীর পিঠে চ'ড়ে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান ক'রলেন। তার পরদিন যখন আত্মীয় স্বজনরা পর্যন্ত তাঁর সাহায্য ক'রতে অগ্রসর হ'ল না, সবাই "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা" নীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রল, তখন তিনি বুঝিলেন—আর বেশীক্ষণ মুর্শিদাবাদে থাকা উচিত হবে না। অগত্যা তিনি বেগমদিগকে আর যৎসামান্য মূল্যবান ধনরত্ন সংগে নিয়ে ভগবানগোলার দিকে রওনা হ'লেন। সেখান থেকে নৌকায় চ'ড়ে তিনি মালদহ জিলার ভিতর দিয়ে বড়দল গ্রামে উপস্থিত হন। তাঁরা তিনদিন অনাহারে ছিলেন। কিছু আহারের ব্যবস্থা ক'রবার জন্য সিরাজ এখানে দানসা নামে এক ফকিরের বাড়ীতে আশ্রয় লন। সিরাজের উপর দান্‌সার পূর্বে বিদ্বেষ ছিল। সুযোগ বুঝে দান্‌সা সিরাজকে ধরিয়ে দিল। এই সময় মীরজাফরের জামাই মীরকাশেম লোকজন নিয়ে সিরাজকে ধরবার জন্য দেশে ঘুরছিলেন।

দান্‌সা তাঁর কাছে খবর দিল। মীরকাশেমের লোকজন গিয়ে সপরিবারে সিরাজকে বন্দী ক'রল। সিরাজ মীরকাশেমের পায় পড়ে বারবার প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। শেষে তাঁকে মুর্শিদাবাদে পাঠান হ'ল। এইখানেই মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে তিনি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে নিহত হন। তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ হাতীর পিঠে চড়িয়ে রাজপথে প্রদক্ষিণ করান হয়েছিল।

সিরাজের সংগে অনেকগুলি বেগম ছিলেন। সিরাজ লুৎফউন্নেসাকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসতেন। তাঁর সংগে বহুমূল্য অলংকার ও মুক্তায় ভরা বাক্স ছিল। মীরকাশেম ভয় দেখিয়ে সেই বাক্সটি হস্তগত ক'রলেন। দেখাদেখি অন্যান্য সকলে যে যা পারল হস্তগত ক'রল। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে লুৎফউন্নেসার জহরতের বাক্সের দাম ছিল লক্ষ লক্ষ টাকা।

হত্যা আর লুণ্ঠন চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলংকিত ক'রে এসেছে। ভারতের ইতিহাসে চেংগেশ খাঁ, তৈমুরলংগ, নাদির শার লুণ্ঠন কাহিনী মানবজাতির পক্ষে ঘৃণিত। আর বর্তমান যুগেও সেই হত্যা, সেই লুণ্ঠন চল্‌ছে। ১৯৩৯-৪৫ সালের বিশ্বযুদ্ধে কে কত নৃশংস নরহত্যা করিতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা হয়েছে। সুতরাং মীরণ, বা মীরকাশিমকে বেশী দোষ দেওয়ার আর কি আছে?

— — —



মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক

২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ হয়, আর ২৯শে জুন মুর্শিদাবাদের মনস্‌সুরগঞ্জ প্রাসাদে মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক হয়। ক্লাইব মীরজাফরকে প্রকাণ্ড হলের মধ্যে সজ্জিত মসনদে হাতে ধ'রে বসিয়ে তাঁকে "বংগ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার" ব'লে সম্বোধন ক'রলেন, আর কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে তাঁকে স্বর্ণমুদ্রা নজরানা দিলেন। তারপর মীরজাফরের পালা। পরদিন লুণ্ঠিত ধনরত্ন ভাগ করার সভা বস্‌ল।

সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত উঠেছিল - দেবতারা সে অমৃত নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন। পলাশী সমুদ্র মন্থন করে ইংরেজ কোম্পানীর দেবতারা মুর্শিদাবাদের রাজকোষ লাভ করেছিলেন। এখন সকলের দৃষ্টি সেইদিকে প'ড়ল। বেচারা মীরজাফর প্রতিশ্রুতি মত টাকা ত' দিতেই পারলেন না বরঞ্চ কোম্পানীকে যে টাকা দেওয়ার কথা ছিল, তারও অর্ধেক টাকা দিয়ে বাকী অর্ধেকের জন্য কিস্তিবন্দি করা হ'ল। কিন্তু দেবতাদের নৈবেদ্য ত' কিস্তিতে দিলে চলবে না—

সংগে সংগে মুর্শিদাবাদ রাজকোষের ধনরত্ন ভাগ করে ইংরাজদের দেওয়া হ'ল।

কর্ণেল ক্লাইব	২০,৮০,০০০ টাকা
ড্রেক সাহেব	২,৮০,০০০ টাকা
ওয়াট্‌স সাহেব	১০,৪০,০০০ টাকা
মেজর কিলপ্যাট্রিক	৫,৪০,০০০ টাকা
ম্যানিংহাম	২,৪০,০০০ টাকা
বিচার	২,৪০,০০০ টাকা

এই প্রকারে বাকী ইংরেজরা প্রত্যেক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পেলেন। তারপর সেই সব ধনরত্ন সাতশ' সিন্দুকে বোঝাই ক'রে একশ' নৌকার সাহায্যে বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে বৃটিশের রণবাদ্যে জল উদ্বেলিত ক'রে ক'লকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

উমিচাঁদ প্রথম থেকেই আশা করেছিলেন যে তিনিও মোটা টাকা পুরস্কার লাভ ক'রবেন। সেই লোভে নিজের প্রাণকে বিপন্ন ক'রেও তিনি মধ্যস্থতা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে অমৃতের পরিবর্তে জুটল' বিষ। কার্যকালে মহানুভব ক্লাইব সাদা কাগজে লেখা সন্ধিপত্র প্রকাশ করে দেখালেন— তাতে উমিচাঁদের নাম গন্ধ নাই। উমিচাঁদের মাথায় বাজ প'ড়ল, উমিচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন।

———

নবাব নয় গোলাম

মীরজাফর নামে ছিলেন বাঙ্লার এক নবাব আর প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইংরেজের দাসানুদাস। তিনি সন্ধিপত্র অনুযায়ী টাকা দিতে পারেন নি বলে ইংরেজদের আনুগত্য মেনে চলতেন—ইংরেজ কোম্পানী যখন যে আবদার ধ'রত, তিনি তা' পূরণ না ক'রে পারতেন না। প্রথমত ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য ক'রতে লাগলেন। অবশ্য কোম্পানী বাঙ্লাদেশে ব্যবসা করবার জন্য বার্ষিক শুল্ক দিত। ইংরেজরা ব্যক্তিগতভাবে যে ব্যবসা ক'রতেন, তার জন্য পৃথক শুল্ক দেওয়ার দরকার। কিন্তু তারা কোম্পানীর পতাকা তুলে দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসার শুল্ক এড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল। নবাব এসব ভালভাবেই জান্‌তেন, তবু কিছু উচ্চবাচ্য ক'রতে সাহস ক'রতেন না। তিনি ইংরেজদিগকে কলিকাতার জমিদারী দিয়ে দেন, কলিকাতায় টাকশাল স্থাপন করবারও আদেশ দেন। তারপর বিহারের সোরার ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার পর্যন্ত ইংরেজদিগকে দেওয়া হ'ল। ইংরেজরা লবংগ ও সুপারির ব্যবসা আরম্ভ ক'রলেন। এই সব কারণে দেশীয় বণিকদের

যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে লাগল। কারও আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, ইংরেজই দেশের প্রকৃত মালিক। মীরজাফর নিজের অসহায় অবস্থা বেশ বুঝতে পারলেন। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত তাঁকে ঘৃণা ক'রতে লাগল। রাজ্যে বিশৃংখলা উপস্থিত হল। ক্লাইব পরামর্শ দিলেন, "আমরা আপনার রাজ্য রক্ষা করব। অতএব আপনি বেশী সৈন্য রেখে খরচ বাড়াবেন না। অর্ধেক সৈন্য বরখাস্ত করে দিন।" মীরজাফর বুঝলেন সবই, কিন্তু "টু" শব্দটি করবার মত ক্ষমতা বা সাহস তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। অতএব ক্লাইবই প্রকৃত পক্ষে বাঙ্‌লা শাসন ক'রতে থাকলেন। আর মীরজাফর হলেন নৈবেদ্যের সন্দেশ।

ইংরেজ যে বাঙ্‌লার সর্বেসর্বা হ'য়ে বসবে, একথা ষড়যন্ত্রকারী মাতব্বরেরা কেউই ভাবেন নি। স্বয়ং মীরজাফর ভেবেছিলেন—সিংহাসন পাওয়ার জন্য ইংরেজদের প্রচুর ধনরত্নের লোভ দেখান যাক ; নবাব হওয়ার পর অল্পস্বল্প কিছু দিয়ে তাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে দেওয়া যাবে। আর কর্ণেল ক্লাইবের সম্বন্ধে তিনি ভাবতেন যে, ক্লাইব ত দেবতুল্য লোক। কিন্তু সবই হল বিপরীত। মীরজাফর নবাব হবার পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা উচ্চ উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। কা'র আশা মিটল, কা'র আশা মিটল না। তাঁরা ক্ষেপে গেলেন। আবার অনেকে ক্লাইবকে তোয়াজ ক'রতে লাগলেন। ক্রমশঃ সকলের ভুল ভাঙ্‌ল। সকলে বুঝতে পারলেন—

বাঙ্‌লাদেশ ইংরেজবণিকের রাজ্য হ'য়ে গিয়েছে। দেশের লোক বুঝে নিল—মীরজাফর "ক্লাইবের গর্দভ।" ক্লাইব ঘাস-জল দিলে মীরজাফর খেতে পাবে, নচেৎ নয়। আর সারাজীবন তাকে ক্লাইবের হুকুম তামিল ক'রতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মীরজাফর এত উত্যক্ত হ'য়ে উঠলেন যে, তিনি ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণ ইংরেজের ঘোর শত্রু হ'য়ে উঠল। ইংরেজরা মীরণকে খুব ভয় ক'রে চলতে লাগল। কিন্তু হতভাগ্য মীরণ বজ্রাঘাতে মারা গেল। সংগে সংগে মীরজাফরের সব আশা-ভরসা ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ল। তিনি ইংরেজের কেনা গোলাম হ'য়ে প'ড়লেন।

কূট-কৌশলী হলওয়েল

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব বিলাত গেলেন। তখন হলওয়েল সাহেব অস্থায়িভাবে কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হলেন। কথা হ'ল—মাদ্রাজ থেকে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব এসে পৌঁছালে পর তিনিই প্রেসিডেণ্ট হবেন। ইতিমধ্যে হল্‌ওয়েল কার্যভার নিলেন। হলওয়েল বড় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর

কলমের জোর ছিল খুব বেশী। তিলকে তাল ক'র্তে, মিথ্যার উপর রং ফলিয়ে লোকজনের মনে তাক লাগিয়ে দিতে হলওয়েলের জোড়া ছিল না ত্রিসংসারে।

তিনিই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন, অন্ধকূপ হত্যার তাজ্জব ব্যাপার। এইটি নাকি পলাশী যুদ্ধের আগেকার ঘটনা—নবাব সিরাজদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জয়ের পর ১৪৬ জন ইংরেজ নরনারীকে একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে আটক রেখেছিলেন। ঘরের ছোট্ট ছোট্ট তু'টী জানালা ছিল। গ্রীষ্মকালে এইটুকু ঘরের মধ্যে থেকে জল-বাতাস না পেয়ে বন্দীদের দম বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগল; নিঃশ্বাস লওয়ার জন্য জানালার কাছে হুড়াহুড়ি করতে লাগল। পানীয় জলের অভাবে বন্দীরা পরস্পরের গায়ের ঘাম চেটে খেতে লাগল। এই রকম করে শেষ পর্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করে সেই রাত্রির মধ্যে ১২৩ জন স্বর্গে আরোহণ ক'রল, আর মর্তে রইল মাত্র ২৩ জন। এই ২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল সাহেব একজন। এরই নাম অন্ধকূপ হত্যা।

এই সংবাদ প্রচারের ফলে মাদ্রাজের ইংরেজরা ক্ষেপে উঠল। সকলের মুখে এক কথা—"চাই প্রতিহিংসা।" সংগে সংগে মাদ্রাজ থেকে ওয়াট্‌সন ও ক্লাইবকে কলিকাতা জয়ের জন্য পাঠান হ'ল। এঁরা এসে কলিকাতা দখল ক'রলেন। নবাবের সংগে সন্ধিও হ'ল। তারপর মীরজাফরের সংগে ষডযন্ত্র ক'রে ক্লাইব সিরাজকে আক্রমণ ক'রতে চললেন।

পলাশীতে হ'ল যুদ্ধ। সিরাজের হ'ল পতন,—ইংরেজ হল বাঙ্লার অধীশ্বর।

এই বিরাট পর্বের পেছন থেকে হলওয়েলের বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইংরেজদিগকে প্রবল উত্তেজনা দিয়ে এসেছে। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী যে নিছক মিথ্যা তা' ঐতিহাসিকরা সুন্দররূপে প্রমাণ ক'রেছেন। সেজন্য অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী আজকালকার ইতিহাসে স্থান পায় না। কূটকৌশলীদের কৌশলে এরই জন্য কলিকাতা ডালহৌসী স্কোয়ারে "হলওয়েল স্মৃতি-স্তম্ভ" নির্মিত হ'য়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট সেই স্মৃতি-স্তম্ভ অপসারণ ক'র্‌তে বাধ্য হ'য়েছেন।

একথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে, হলওয়েল সাহেবের বাহাদুরী আছে। তাঁর চিঠি লেখার কেরামতিতেই দেশে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। মুসলমান শাসনের সমাধি আর ইংরেজ শাসনের জন্ম অনেকটা তাঁরই কলমের খোঁচায় সম্ভব হ'য়েছিল। তাই বলা হয় "Pen is mightier than the sword" অর্থাৎ তরবারি অপেক্ষা কলমের জোর বেশী। এই হলওয়েল সাহেবই হ'লেন কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট।

পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি মীরজাফরের কাছে মাত্র এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাতে তিনি আদৌ সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। সেজন্য এবার প্রেসিডেণ্ট হ'য়েই পুরস্কারের সুযোগ

খুঁজতে লাগলেন। তিনি পূর্বেই দেখেছিলেন—ক্লাইবের মত মাতব্বররা মোটা মোটা টাকা আর মণিমুক্তা নিয়ে দেশে ফিরলেন। আর তাঁর ভাগ্যে কিনা মাত্র এক লক্ষ টাকা।

মীরকাশেম নবাব মীরজাফরের জামাতা। জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মৃত্যুর পর থেকেই নবাব দুঃখে শোকে জর্জরিত হ'য়ে কোনরূপে রাজকার্য চালাচ্ছিলেন। তাঁর না ছিল প্রাণে আনন্দ, না ছিল কর্মে উৎসাহ। মীরকাশেম তখন নবাবের প্রিয়পাত্র। বিশেষ ভারী কাজগুলির ভার তখন মীরকাশেমের উপরেই থাক্‌ত। মেদিনীপুর অঞ্চলে মারাঠারা লুণ্ঠন আরম্ভ করেছিল। সেই আক্রমণ দমন করবার জন্য নবাব মীরকাশেমকে মেদিনীপুরে পাঠালেন। পথে তাঁর সংগে হল হলওয়েলের দেখা। কথাবার্তায় উভয়ের মনোভাব উভয়ে বুঝতে পারলেন। মীরকাশেম পাটনার নবাবীর জন্য হলওয়েলের কাছে নিবেদন জানালেন। হলওয়েলও বুঝলেন—এখানে প্রচুর পুরস্কারের সম্ভাবনা আছে। বিশেষতঃ লুৎফউন্নেসা বেগমের যে সব মণিমুক্তা মীরকাশেম হস্তগত ক'রেছিলেন, সেইদিকেই হলওয়েলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

হলওয়েল অবিলম্বে নবাব মীরজাফর ও সেনাপতি কেল্‌ডের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন যে, মীরকাশেমকে পাটনার নবাবী দেওয়া দরকার। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। এদিকে ভ্যান্সিটার্ট কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট্ হ'য়ে এসে পড়লেন। হলওয়েলের মতলবটা তখনকার মত ফেঁসে গেল। কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট নূতন লোক। তিনি হলওয়েলের পরামর্শ না

নিয়ে কোন কাজ করতেন না। হলওয়েল পূর্বেই মীরজাফরের বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। তাতে তিনি সত্য-মিথ্যার খিচুড়ী পাকিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন যে, মীরজাফর একটা অযোগ্য লোক, তার দ্বারা দেশ শাসন অসম্ভব।

খোজা পিক্র ছিল ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যস্থ। তার হাত দিয়ে মীরকাশেম ইংরেজের দরবারে চিঠিপত্র পাঠাতে লাগলেন। হলওয়েল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য সভ্যদের মনটা প্রস্তুত ক'রতে থাকলেন। এইভাবে কাজ চলতে থাকল। এদিকে মীরকাশেমকে নিয়ে পাকাপাকি ষড়যন্ত্র করার দরকার,—অছিলারও অভাব হ'ল না। ইংরেজ পক্ষ নবাবকে জানালেন যে, সামরিক পরামর্শের জন্য মীরকাশেমের কলিকাতায় আসা বিশেষ দরকার। নবাবও নিঃসংকোচে মীরকাশেমকে কলিকাতায় পাঠালেন। মীরকাশেম ষড়যন্ত্রের পাকা ব্যবস্থা ক'রে ফিরে গেলেন।

আবার ষড়যন্ত্র

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর মীরকাশেম কলিকাতায় পৌঁছালেন। খোজা পিদ্রুর মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। যথাসময়ে কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যরা একবাক্যে স্থির করলেন যে, মীরকাশেমকে সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়া হবে। ২৭শে তারিখে ইংরেজরা সিলেক্ট কমিটীতে গোপনে একটি সন্ধিপত্র স্থির ক'রলেন। তার মর্ম হচ্চে এই যে—মীরজাফর নামেমাত্র নবাব থাকবেন, মীরকাশেম হবেন নায়েব-নবাব। তিনিই রাজকার্য চালাবেন এবং মীরজাফরের মৃত্যুর পর স্বয়ং নবাব হবেন। ইংরেজের সৈন্য মীরকাশেমের রাজকার্যে সবরকম সাহায্য করবে। এই সৈন্যদলের খরচ নির্বাহের জন্য কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম দেওয়া হবে।

তারপর কোম্পানীর কর্মচারীদের দক্ষিণার কথা। প্রথমে তাঁরা মহত্ব প্রকাশ ক'রে বললেন যে, পুরস্কার স্বরূপ টাকা-পয়সা লওয়া তাঁদের দ্বারা হবে না। পরে মীরকাশেমের সম্মান রক্ষার জন্যই তাঁরা যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ ক'রতে রাজী হ'লেন। সেই যৎকিঞ্চিতের ফর্দটী হচ্চে এই :—

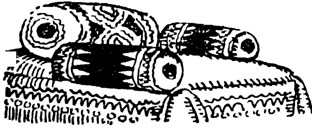
মিঃ সামার	২,৮০,০০০ টাকা	
„ হলওয়েল	৩,০০,০০০	„
„ ম্যাগোয়ার	১,৮০,০০০	„ এবং ৫০০০ মোহর
„ ভ্যান্সিটার্ট	৫,৮০,০০০	„
„ স্মিথ	১,৩৪,০০০	„
„ মেজর ইয়র্ক	১,৩৪,০০০	„
„ কর্ণেল কেল্‌ড	২,০০,০০০	„

ইংরেজ দরবারের অন্যান্য সভ্যেরা ষড়যন্ত্রের বিষয় ঘুর্ণাক্ষরে জানতে পারলেন না।

মীরকাশেম ইংরেজদের সংগে সব ষড়যন্ত্র ঠিক ক'রে ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করলেন। সেই সময় মুর্শিদাবাদের নিকট কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠি ছিল। ব্যবস্থামত ২রা অক্টোবর গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর সেনাপতি কেল্‌ড মুর্শিদাবাদ যাত্রা ক'রলেন এবং ১৪ই কাশিমবাজারে পৌঁছালেন। নবাব মীরজাফর গবর্ণরকে সম্মান দেখাবার জন্য ইংরেজের কাশিমবাজারের কুঠিতে এলেন এবং যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন ক'রলেন। তারপর আরও দু'বার নবাবের সংগে গবর্ণরের সাক্ষাৎ হল, কিন্তু নবাব দেখলেন, গবর্ণরের কথাবার্তার ভাবটা যেন কেমন কেমন। তিনি বলতে চান—ইংরেজের ও নবাবের সৈন্যরা রীমিমত বেতন পাচ্ছেনা। নবাবের কর্মচারীরা অযোগ্য আর তার উপরে অত্যাচারী। যুদ্ধের জন্য নবাব মাসিক যে এক লক্ষ টাকা দিচ্ছেন, তাতে খরচ সংকুলান হয় না, কিছু ভূমি দিলেই

ভাল হয়। আসল কথা হচ্ছে "নবাবের কাজকর্ম আদৌ সুবিধা হচ্ছে না।" ভ্যান্সিটার্ট সাহেব চালাক লোক ত' বটে,—তারপরেই বল্‌লেন "এতদিন আপনার পুত্র মীরণ নায়েব-নবাব ছিলেন, তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে। আপনার ছেলেদের মধ্যে কাউকে এই কাজের ভার দিলে ক্ষতি কি? আপনি ত' বৃদ্ধ হ'য়েছেন।" ক্রমশঃ শেষ পর্যন্ত চতুর ভ্যান্সিটার্ট বল্‌লেন, "আচ্ছা, মীরকাশেম ত' আপনার নিজের জামাতা; তাঁকে যদি নায়েব-নবাব করেন, তবে ত' ভালই হয়, তাতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি থাকতে পারে না।"

মীরজাফর সংগে সংগে কথাটার অর্থ বুঝে নিলেন। ইংরেজের সংগে তিনি তিন বছর ধরে মিতালি ক'রে এসেছেন। সুতরাং, এই ক'বছরের ব্যবহারে তিনি তাঁর ভিন্‌দেশী বন্ধুদের কিছু কিছু চিনেছেন। তিনি গবর্ণরের কথা শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তারপর একান্ত ক্ষুব্ধমনে নবাব রাজধানীতে ফিরে গেলেন।



মীরকাশেমের সিংহাসন লাভ

দু' একদিন পরের ঘটনা। অতি প্রত্যূষে নবাব মীরজাফর শয্যা ত্যাগ ক'রে যেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, অমনি দেখতে পেলেন যে, বহু ইংরেজসৈন্য তাঁর প্রাসাদ বেষ্টন ক'রে আছে। আর স্বয়ং সেনাপতি কেলড্ গবর্ণরের চিঠি হাতে নিয়ে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপরেই মীরকাশেমের সৈন্যগণ রণবাদ্য বাজাতে বাজাতে ইংরেজসৈন্যের সংগে যোগ দিল। নবাবের আর কিছু বুঝবার বাকী রইল না। তিনি বুঝলেন, সিরাজের প্রতি তাঁর ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় উপস্থিত হ'য়েছে। একবার ভাবলেন—একটু লড়েই দেখিনা কেন। কিন্তু দম্‌কা হাওয়ায় বাতি যেমন জ্বলে উঠেই পরক্ষণে নিভে যায়, তাঁর শোকগ্রস্ত হৃদয় তেমনি একটু জেগে উঠেই নির্বাপিত হ'ল। তারপর এক এক করে সমস্ত পূর্ব-কাহিনী তাঁর মানসপটে উঠতে লাগ্‌ল। সিরাজের নৃশংস হত্যা—হাতীর পিঠে চড়িয়ে তাঁর মৃতদেহের নগর প্রদক্ষিণ—তাঁর পরিবারবর্গের লাঞ্ছনা—সমস্তই তাঁর চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতে লাগল। তখনই তিনি তাড়াতাড়ি স্থির করলেন—এ অবস্থায়

এখানে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। তিনি থাকবেন নবাব, আর মীরকাশেম চালাবেন রাজকার্য ; এ অবস্থায় তাঁর নিহত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তিনি ইংরেজের কাছে প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন যে, তাঁরা যদি তাঁর প্রাণরক্ষার দায়িত্ব লন, তবে সমস্ত রাজ্যভার মীরকাশেমকে দিয়ে তিনি কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয়ে বাস করবেন। কেলড্ ও ভ্যান্সিটার্টের সংগে তাঁর দেখা হ'ল। তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজী হ'লেন। ইংরেজরক্ষীর তত্ত্বাবধানে তাঁকে কলিকাতায় আনা হ'ল। মীরকাশেম নির্বিবাদে, বিনাযুদ্ধে, বিনারক্তপাতে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার ক'রে বসলেন।

যে ইংরেজ মীরজাফরকে হাতে ধরে সিংহাসনে বসিয়েছিল, সেই ইংরেজ তাঁর কানে ধরে সিংহাসন থেকে নাবিয়ে দিল। ইংরেজ তার স্বার্থের খাতিরেই মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়েছিল, আবার তার স্বার্থের খাতিরেই মীরকাশেমকে সিংহাসনে বসাল। সেদিন ইংরেজ ভাবতে পারেনি যে, মীরকাশেম শান্তপ্রকৃতির মেষশাবক নয়, সে সিংহশাবক। আবশ্যক হ'লে সে ইংরেজের ঘাড়ে থাবা বসিয়ে দিতে পারে,—ইংরেজের রক্তে রক্ত-গংগা বহাতে পারে।

মীরকাশেমের শাসন-ব্যবস্থা

মীরজাফর ছিলেন ইংরেজের গোলাম। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন একেবারে অপদার্থ, বুদ্ধিহীন। মীরকাশেম ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক। কেবল সিংহাসন লাভ করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না,—বাঙ্‌লাদেশে ইংরেজের কর্ত্তৃত্বকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে মোগলের অবাধ নেতৃত্ব স্থাপন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বেশ বুঝে নিয়েছিলেন, দু'টি কারণে নবাব মীরজাফরকে ইংরেজের মন যুগিয়ে চলতে হ'ত। প্রথমত ইংরেজ কোম্পানীর কাছে নবাব ছিলেন ঋণী; দ্বিতীয়ত, ইংরেজসৈন্যের সাহায্য না পেলে রাজ্যরক্ষা করা চল্‌ত না। মীরকাশেম সিংহাসনে বসবার মুহূর্ত্ত থেকেই অর্থ সঞ্চয়ে মন দিলেন, যে কোনও রকমে ইংরেজের কাছে অঋণী হ'তেই হবে। তারপর ইউরোপীয় প্রথায় দেশীয় সেনাদল গ'ড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ ও পাটনার দেশীয় সৈন্যেরা অনেকদিন বেতন না পেয়ে অধীর ও অশান্ত হ'য়ে উঠেছিল, তাদেরও শান্ত করা দরকার।

সিংহাসনে বসে তিনি রাজকোষে মাত্র ৫০ হাজার টাকার

সন্ধান পেলেন, আর তিন লক্ষ টাকার তৈজসপত্র দেখতে পেলেন। তিনি তৈজসপত্রগুলি ভেংগে অবিলম্বে মুদ্রা প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন। মণিমুক্তা প্রভৃতি যা পেলেন, তা সবই তিনি বিক্রী ক'রলেন। তারপর যে সব কর্মচারী রাজস্ব অপহরণ ক'রেছে বলে তাঁর বিশ্বাস জন্মাল, তা'দিগকে কারারুদ্ধ ক'রে জোর-জবরদস্তি ক'রে তাদের কাছ থেকেও বহু অর্থ আদায় করলেন। মীরজাফরের প্রিয় অনুচর কিনুরাম ও মণিলালের যথাসর্বস্ব বাজেয়াপ্ত ক'রে নেওয়া হল, আর হিসাব দিতে না পারায় তা'দিগকে কারাগারেই প্রাণ হারাতে হ'ল।

এই রকম নানা প্রকারে অর্থ সংগ্রহ ক'রে সিংহাসনে বসবার একমাসের মধ্যেই মীরকাশেম অবস্থা অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনলেন। ইংরেজ কোম্পানী আড়াই লক্ষ টাকা পেয়ে ভারি খুসি হ'য়ে গেলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবসেনা বেতন পেয়ে শান্ত হ'ল। পাটনাতে নবাবসেনার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা আর ইংরেজসেনার জন্য দু'লক্ষ টাকা কর্ণেল কেলুডের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপরেও পাটনা ও কাশিমবাজারের ঋণ পরিশোধ ও সেনাদলের খরচ সরবরাহের জন্য মীরকাশেম লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে লাগলেন। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব ত' আহ্লাদে আটখানা। তিনি ইংরেজমহলে ঘোষণা ক'রতে লাগলেন— "আমি যোগ্যলোক নির্বাচন করেছি।" কিন্তু যে সব ইংরেজ সদস্যকে গোপন ক'রে ষড়যন্ত্র হ'য়েছিল তাঁরা পুরস্কারের ভাগ না পেয়ে ভীষণ খাপ্পা হ'য়ে গেলেন। তাঁরা ব'লে বেড়াতে

লাগলেন—মীরকাশেমের কোন যোগ্যতা নাই ; সে একটা ভীষণ অত্যাচারী, সে লোকের উপর অত্যাচার ক'রে অর্থসংগ্রহ ক'রছে।

তারপর মীরকাশেম ভেবে দেখলেন যে, ইংরেজসৈন্যের ব্যয়-নির্বাহের জন্য কয়েকটী অঞ্চল ইংরাজ কোম্পানীকে একেবারে দান ক'রে দেওয়াই ভাল। তখনকার দিনে মারাঠাদের অত্যাচারে বর্ধমান আর মেদিনীপুর অঞ্চল বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। আর মগ্ ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে চট্টগ্রামের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হ'য়েছিল। এই কয়েকটি অঞ্চলে আক্রমণ, লুটপাট লেগেই থাকত, রাজস্ব আদায় করাও কষ্টসাধ্য ছিল। সুচতুর মীরকাশেম ইংরেজ কোম্পানীকে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম দান ক'রলেন। তাঁরাই রাজস্ব আদায় ক'রবেন আর শান্তিরক্ষা ক'রবেন। ইংরেজরাও খুসি হলেন, কেননা তাঁরা এই প্রথম ভূমির মালিক হ'লেন।

নতুন নবাব ব্যয়সংকোচের জন্যও সাধ্যমত চেষ্টা করে-ছিলেন। অযথা নাচ-গান, হাস্য-কৌতুকে বহু অর্থ ব্যয় হ'ত ; সে সমস্ত বাজে অনুষ্ঠান বন্ধ হ'য়ে গেল। এমন কি নবাব মহলে দাসদাসীর সংখ্যাও অনেক কমিয়ে দেওয়া হ'ল। এই প্রকারে আর্থিক ব্যাপারে মীরকাশেম কোন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁর ক্রিয়াকলাপগুলি খুবই যুক্তিসঙ্গত ও সময়োচিত হ'য়েছিল। শাসনভার হাতে পেয়েই এতগুলি পরিবর্তন সাধন করা ক্ষমতাশালী যোগ্য শাসকেরই কাজ। তিনি বুঝতেন,

শ্বশুরের সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তিনি অনেকের চক্ষুশূল হ'য়েছেন। কিন্তু তিনি একথাও বিশ্বাস ক'রতেন, যে রকমেই তিনি নবাবী লাভ করুন না কেন, রাজ্যে শৃংখলা আন্‌তে পারলে, লোকে তাঁর দোষের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হবে।

মীরকাশেম উচ্চাভিলাষী কিন্তু অকৃতজ্ঞ ছিলেন; তবে তিনি সুদক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। ইংরেজেরা তাঁকে প্রথমে চিন্‌তে পারেননি, পরে অবশ্য তাঁরা মীরকাশেমকে যথেষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। ইংরেজ ছিল যেমন কূটকৌশলী, মীরকাশেম ছিলেন তাঁদের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। তিনি অপরের হাতের পুতুল হওয়ার লোক ছিলেন না।



মীরকাশেম শান্তিতে রাজ্যশাসন ক'রতে পারেন নি। রাজ্যলাভ করেই তাঁকে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হতে হ'ল। তখন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই বিদ্রোহ,—মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম—চারিদিক থেকেই বিদ্রোহের সংবাদ নবাবের কাছে পৌঁছতে

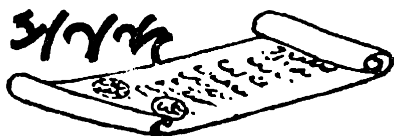
লাগল। অবিলম্বে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা ক'রতে হ'ল। ক্যাপ্‌টেন মার্টিন হোয়াইট একদল গোরা ও দেশী সিপাহী আর গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হ'লেন। তিনি মেদিনীপুরে ও বর্ধমানে বিদ্রোহ দমন করে বীরভূমের দিকে অগ্রসর হ'লেন। বীরভূমের জমিদার আসদ্‌ জামান খাঁ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুনিপুণ যোদ্ধা। তিনি কড়েয়ার দুর্গম প্রদেশে ছাউনি ফেলে তার চার পাশে গড়খাই কেটে কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য আর পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা ক'রছিলেন। তখন স্বয়ং মীরকাশেম দেশীয় সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়ে মেজর ইয়র্ক সহ অগ্রসর হ'লেন। তাঁরা বুধগ্রামে ছাউনি ফেললেন, আর অন্যদিক থেকে ক্যাপ্‌টেন মার্টিন হোয়াইট জামান খাঁ'কে অতর্কিত আক্রমণ ক'রলেন। সেই সংগে মীরকাশেম ও ইয়র্কের সৈন্য জামান খাঁ'র পলায়নপর সৈন্যকে আক্রমণ ক'র্‌ল। জামান খাঁ সম্পূর্ণ পরাজিত হ'লেন। বাংলা দেশ থেকে বিদ্রোহীরা নিশ্চিহ্ন হ'ল।

এই যুদ্ধযাত্রা থেকে নতুন নবাবের একটা মস্ত বড় শিক্ষা হ'য়ে গেল। তিনি স্বচক্ষে দেখলেন যে, দেশীয় সিপাহীরা একেবারে অযোগ্য সৈনিক—তাদের না আছে উৎসাহ, না আছে শিক্ষা, না আছে শৃংখলা। তিনি বেশ বুঝে নিলেন—এই সৈন্যদের মাঝখানে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু ক'রতে না পারলে, যুদ্ধ-প্রণালীর আমূল সংস্কার ক'রতে না পারলে, তারা

কোন যুদ্ধেই ইউরোপীয় সৈন্যের সংগে সমানে যুদ্ধ ক'রতে সক্ষম হবে না। সেই সময় থেকে দেশীয় সৈন্যকে সুশিক্ষিত ক'রে তোলবার কল্পনা তাঁর প্রাণকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌ল।

এই ঘটনার পর নবাবের সৈন্য মুংগেরের কাছে করকপুর রাজ্য আক্রমণ ক'রল। করকপুরের বিদ্রোহী রাজা বীরবিক্রমে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা ক'রেও হেরে গেলেন—তাঁর মনোরম রাজধানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল।

বাদশাহী সনদ



যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা কচ্ছি, সে সময় দিল্লীর সম্রাট আজিমুদ্দিনের ক্ষমতা একেবারে মাটির ধূলোতে মিশে গিয়েছিল। তাঁর উজীর অর্থাৎ মন্ত্রীমশাইএর জ্বালাতেই তিনি অস্থির। মন্ত্রী গাজীউদ্দীন তখন সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস ক'রে বসেছে। সম্রাটের 'টু' শব্দটী করবার পর্যন্ত ক্ষমতা ছিল না। এই অবস্থায় মোগল সাম্রাজ্যকে মুক্ত করবার জন্য একজন প্রাণপাত চেষ্টা ক'রছিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শা'আলাম। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মোগল সাম্রাজ্যে নিজের

আধিপত্য বিস্তার ক'রে নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করা। সেজন্য তিনি মারাঠাদের ও অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। শা'আলাম বিহার অঞ্চলে ঘাঁটী গেড়ে বসেছিলেন এবং পূর্বদিকে বাংলাদেশেও তাঁর অগ্রসর হওয়ার কল্পনা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন—বাংলা-বিহার তাঁকে সম্রাট ব'লে গ্রহণ করুক। ইংরেজরা দেখলেন, শা'আলামের কর্তৃত্ব বিস্তৃত হ'লে তাঁদের কর্তৃত্ব নষ্ট হবে। বাংলাদেশে তাঁদের যে প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে তাও শূন্যে মিলিয়ে যাবে। অতএব ইংরেজরা শা'আলামকে বশীভূত ক'রতে অগ্রসর হ'লেন। মেজর কার্ণাক বাংলার সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। বিহারের তিন ক্রোশ পশ্চিমে সোয়ান নামে একটী গ্রামে বাংলার সৈন্যদল শা'আলামের সৈন্যদলকে আক্রমণ ক'রল। শা'আলাম একটী সুশিক্ষিত হাতীর পিঠে চড়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে যুদ্ধের গতি অন্যদিকে ঘুরে গেল। একটী গোলার আঘাতে শা'আলামের হাতীটী আহত হ'য়ে রণক্ষেত্র ফেলে দৌড় দিল, সংগে সংগে তাঁহার সৈন্যেরাও ছত্রভংগ হ'য়ে পলায়ন ক'রল। কার্ণাক শত্রুসৈন্যের পিছু পিছু তাড়া ক'রে গেলেন, শা'আলাম পরাজিত হ'লেন। এই ঘটনার পরেও শা'আলাম আবার সৈন্যসংগ্রহ ক'রে যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু তিনি কোন রকমেই সুবিধা করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি ইংরেজের প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরেজ শিবিরে আগমন করলেন।

ইংরেজরা বড়ই বুদ্ধিমান্ আর ভাগ্যবান জাত; বহু যুদ্ধ ভাগ্যের জোরে ও কূটকৌশলে জয়লাভ করেছে। এমন বুদ্ধিমান্ ও কূটকৌশলী জাত আর দ্বিতীয় নাই। তাঁরা দিল্লীর ভাবী সম্রাট শা'আলামকে নিজের শিবিরে পেয়ে তাঁর কোন অসম্মান ত' ক'রলেন না, বরং তাঁকে বিশেষ সমাদরে শিবিরে অভ্যর্থনা ক'রে নিলেন। তাঁকে "বাদশাহ" বলে ঘোষণা করা হ'ল; সেই সংগে তাঁর জন্য দৈনিক এক হাজার টাকা খরচের ব্যবস্থা করা হ'ল। তারপর ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁকে সটান পাটনা দুর্গে নিয়ে গেলেন, সেখানে বাদশাই চালে তাঁর আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল।

এখন শা'আলাম ভাবলেন—যদি ইংরেজরা আমাকে বাদশাহী সিংহাসন লাভে সাহায্য ক'রতে রাজী হয়, তাহ'লে খুব আশার কথা। কিন্তু ইংরেজদের তখনকার যা ধনবল আর লোকবল, তা' নিয়ে তাঁরা অতদূর সাহস করলেন না। তবে শা'আলামকে দিয়ে তাঁদের নিজেদের কাজ হাসিল ক'রে নিলেন। বাংলা-বিহারে কর্তৃত্ব ও বাণিজ্য অটুট রাখবার জন্য তাঁরা তখন বদ্ধপরিকর। তাঁদের মনোনীত নবাব মীরকাশেমকে যদি শা'আলাম বাংলা-বিহারের সুবেদার বলে স্বীকার করেন, তবেই তাঁদের জয় জয়কার হবে। এই ভেবে তাঁরা ১২ই মার্চ পাটনায় এক দরবারের আয়োজন করলেন। মীরকাশেম পাটনা দুর্গে গিয়ে শা'আলামের সংগে সাক্ষাৎ করা অপমানজনক বোধ করায়, পাটনার ইংরেজ কুঠিতেই দরবার বসল। একটী

হল সুসজ্জিত ক'রে তার মাঝে দু'খানি টেবিল দিয়ে বাদশাহী সিংহাসন তৈরী করা হ'ল। শা'আলাম তার উপর আসন গ্রহণ করলেন। নবাব মীরকাশেম তাঁকে অভিবাদন ক'রে ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও বহুমূল্য উপহার নজরানা দিলেন। শা'আলাম মীরকাশেমকে বংগ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী পদ দান করলেন। মীরকাশেম নবীন বাদশাহকে প্রতি বছর ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আদবকায়দার অভাব আদৌ ছিল না। তবে কোন পক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। শা'আলাম বুঝে নিলেন—দিল্লীর সিংহাসন লাভের কোন সাহায্য ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। মীরকাশেম বুঝলেন—শা'আলামের সংগে ইংরেজের মিত্রতা-বৃদ্ধিতে তাঁর স্বাধীন হওয়ার পরিকল্পনা খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। বাইরে তিনি মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারলেন না সত্য; কিন্তু স্বাধীন বংগ-বিহারের স্বাধীন নবাব হবার উৎকট বাসনা তাঁর বুকে স্থান পেয়েছিল বলেই এই আনুগত্য স্বীকার তাঁর বুকে গুরুতর আঘাত দিয়ে গেল। তিনি মর্মাহত হ'লেন, কিন্তু এত সহজে উদ্দেশ্য হারাবার মানুষ তিনি নন। তাঁর মনের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে পারল না।



মীরকাশেমকে অনেকে অত্যাচারী নাম দিয়ে নিন্দা করেন। তিনি অত্যাচারী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর অত্যাচার চল্‌ত দেশের ক্ষমতাশালী ধনী, পদস্থ লোকদের উপর, জমিদারদের উপর। তিনি সাধারণ প্রজাদের উপর কখনও অন্যায় অত্যাচার করতেন না ; বরং দরিদ্র প্রজাদের উপর তিনি অনেক সময় দয়া প্রকাশ করতেন। সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে যে ইমামবাড়া তৈরী ক'রে গিয়েছিলেন, তিনি তার আসবাবপত্র বিক্রী ক'রে দরিদ্র লোকদের দান করে দেন। বিহারের নায়েব-নবাব রাজা রামনারায়ণ নানাপ্রকারে মীরকাশেমের বিরোধিতা করতেন। তিনি পাটনার ইংরেজ সেনাপতিদের সংগে ষড়যন্ত্র ক'রে মীরকাশেমের সর্বনাশ করবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। মীরকাশেম শত্রুকে ক্ষমা করবার লোক ছিলেন না। সেজন্য তিনি রামনারায়ণকে কারারুদ্ধ ক'রে এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জোরপূর্বক অধিকার ক'রে অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। রাজা রামনারায়ণের বাড়ী থেকে সাত লক্ষ টাকার জিনিষপত্র লুঠ ক'রে নেওয়া হ'য়েছিল। তাঁর সহকর্মী, কর্মচারী প্রভৃতিরও রেহাই হ'ল না। তাদের উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন

ক'রে, তা'দিগকে কারারুদ্ধ ক'রে টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়া হ'য়েছিল। যে সব ধনী লোকের বাড়ীতে রামনারায়ণ টাকাকড়ি গোপনে সঞ্চিত ক'রে রেখেছেন বলে সন্দেহ হ'য়েছিল, মীরকাশেম সে সব বাড়ী থেকেও টাকাকড়ি লুঠ ক'রে নিয়েছিলেন।

তারপরেই তাঁর শ্যেন দৃষ্টি প'ড়ল দেশের জমিদারদের উপর। তখনকার দিনে জমিদারদের ভয়ে প্রজারা প্রায়ই তটস্থ হ'য়ে থাকত। জমিদারেরা প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার ক'রে ভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন। তাঁরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করতেন অথবা শত্রুপক্ষে যোগ দিতেন। মীরকাশেম এইরূপ বহু জমিদারকে কারারুদ্ধ করলেন। অনেকে জমিদারী ছেড়ে দেশত্যাগী হ'ল। যে সকল কর্মচারীর কার্যকলাপে সন্দেহ এল, তাঁদের নিহত করা হ'ল। দেশময় একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হ'ল।

বাংলাদেশে দিনাজপুর, রাজসাহী ও কৃষ্ণনগরের জমিদারদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে মীরকাশেম জমিদারীর রাজকর পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়ে দিলেন। পূর্বে যে রাজকর আদায় হ'ত, এখন নির্বিবাদে তার অনেক বেশী টাকা আদায় হ'তে লাগল। জমিদাররা বুঝলেন,—বড় শক্ত পাল্লায় পড়া গিয়েছে ; চালাকি করবার উপায়টী নাই। অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে মীরকাশেম অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তখনকার বিদ্রোহ-অশান্তির দিনে শান্তশিষ্টভাবে আর ভালমানুষটি সেজে

কোন কাজ করা যেত না। কঠোর, নিষ্ঠুর না হ'তে পারলে বিদ্রোহের ভাবকে দমন করা সম্ভব ছিল না। নৃশংসভাবে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা না করতে পারলে রাজ্যশাসনের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হ'ত না। এইসব কারণে তখন কঠোরতার খানিকটা দরকার ছিল। অবশ্য মীরকাশেমের সব রকম অত্যাচারকে সমর্থন করা যায় না; তা'হলেও তখন ঘরে-বাইরে শত্রু, চারিদিকে বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র। ঠিক এই রকম সময়ে কঠোর না হ'তে পারলে রাজকার্য চলতে পারে না। প্রজাদের ও জমিদারদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, ইংরেজরাই হর্তাকর্তা। তিনি সে ধারণা সকলের মন থেকে দূর করে দিলেন। সবাই বুঝল, সংগে সংগে ইংরেজ কোম্পানীর লোকেরাও বুঝল যে, মীরকাশেম আর মীরজাফরে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মীরজাফর ছিলেন নামে নবাব, কিন্তু মীরকাশেম স্বাধীনচেতা লোক। তাঁকে পরিচালনা করা ইংরেজের সাধ্য নয়।

নবাব মীরকাশেম দেশীয় সিপাহী ও সেনাপতিদিগকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি জানতেন, ওরা সুবিধাবাদী; যখন যে পথে সুবিধা দেখতে পাবে, ওরা সেই পথই অনুসরণ করবে। সেইজন্য অনেক সময় তিনি সামান্য কারণে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। কিন্তু দেওয়ানী আর ফৌজদারী বিচারে তাঁর খুবই যোগ্যতা ছিল। তিনি সপ্তাহে দু'দিন বিচার করতে বসতেন। ছোটখাট বিচার করা, বিচারের রায় দেওয়ার পর

তাঁর কাছে অনেক সময় আপীলের বিচার হ'ত। তিনি বাদী, বিবাদী আর সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনে সুন্দরভাবে রায় দিতেন। তাঁর ভয়ে জমিদাররা প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে সাহসী হ'ত না। রাজকর্মচারীরা ঘুষ নিলে তাদের আর রক্ষা থাকত না। মীরকাশেম তাদের নিষ্ঠুরভাবে সাজা দিতেন।

মীরকাশেমের ইংরেজবিদ্বেষ

মীরকাশেম চেয়েছিলেন বাংলা-বিহারের প্রকৃত নবাব হ'তে। তিনি একথাও বুঝে নিয়েছিলেন যে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে রাজ্যশাসন করতে হ'লে এবং দেশে সুখ-সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে হ'লে, ইংরেজকে সরাতে হবে। অতএব যে-কোন প্রকারেই হোক্ ইংরেজকে বাংলা-বিহার থেকে দূর করতেই হবে। মীরকাশেম ছিলেন বুদ্ধিমান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর উচ্চাভিলাষী। সাধারণ প্রজার প্রতি তাঁর দরদ ছিল অসাধারণ। তখন ইংরেজরা চারিদিক গ্রাস করে বসেছে, রাজ্যের ফৌজদাররা পর্যন্ত ইংরেজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারত না। তারা

দেশময় একটা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করেছিল। দেশের নবাব, পুলিশ, সৈন্য—সকলকে ইংরেজের ইংগিত মেনে চলতে হবে, তা' না হ'লে তার অস্তিত্ব থাকবে না। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও তখন ইংরেজের হস্তগত। ইংরেজ কোম্পানী বৎসরে নামমাত্র একটা কর দিয়ে সারা বৎসর বিনাশুল্কে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করত, আর কোম্পানীর মালপত্র কিনে ইংলণ্ডে পাঠাত। এ'তে দেশীয় ব্যবসাদারদের ক্ষতি হ'ত না ; কিন্তু দেশের শিল্পীদের ওপর জুলুম আর অত্যাচারের অভাব ছিল না। আবার এই কোম্পানীর কর্মচারীরা দেখলেন যে, তাঁরা যদি ব্যক্তিগত-ভাবে ব্যবসা চালান, তবে বেশ একটা মোটা রকমের অতিরিক্ত আয় হবে। সুতরাং, তাঁরা গোপনে নিজ নিজ ব্যবসা আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা কোম্পানীর পতাকা নিজেদের জাহাজে বা নৌকার উপর তুলে দিয়ে, কোম্পানীর দস্তক ব্যবহার ক'রে কোম্পানীর নামে নিজেরা ব্যবসা চালাতে লাগলেন, অথচ তাঁরা নবাবকে কোন শুল্ক দিতেন না। এদিকে দেশীয় বণিকরা যথারীতি শুল্ক দিতে লাগ্‌ল। তার ফল হ'ল এই যে, দেশীয় বণিকদের মালের দাম ইংরেজ বণিকদের মালের চাইতে অনেক বেশী হ'য়ে পড়ল। দেশীয় বণিকদের মাল ক্রেতারা কিনতে চাইল না। তারা মাথায় হাত দিয়ে বসল। নবাব চারিদিক থেকেই সংবাদ পেতে লাগলেন যে, ইংরেজ বণিকরা শুধু যে সরকারী শুল্ক ফাঁকি দিতেছে তাই নয়, তার সংগে দেশীয় বণিকদের ব্যবসা চালানও অসম্ভব হ'য়ে পড়ছে। কোম্পানীর

কর্মচারীরা এই কাজটাকে অন্যায় বলে জ্ঞান করতেন না। বিলাত থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টররা এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এই দেশের ক্ষতিকর অন্যায় গোপন ব্যবসা বন্ধ করবার হুকুম দিলেন; কিন্তু হুকুম মানে কে? এখানকার ইংরেজরা প্রত্যেকে নিজেকে এক একজন নবাব ধারণা করতেন। অতএব তাঁরা স্বচ্ছন্দে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এই ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সব অন্যায় সহ্য করার মানুষ মীরকাশেম নন। সমস্ত দেখে শুনে তাঁর অন্তর পুড়ে যেতে লাগল। তার ওপর ইংরেজ সেনাপতিরা তার সংগে বড় উদ্ধত ব্যবহার করতে লাগলেন।

শা'আলাম বিহার ত্যাগ করবার পর ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল কূটের সংগে মীরকাশেমের পরামর্শে স্থির হয়, নবাব পাটনা দুর্গে বাস করবেন ও বাদশাহের নামে মুদ্রা প্রচার করবেন। সেই সময় পাটনা দুর্গের ফটকে ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিত। মীরকাশেম বললেন—ইংরেজ সৈন্য ফটকে থাকলে, তাঁর কর্মচারীদের যাতয়াতে অসুবিধা হবে, অতএব ঐ সৈন্যগুলি সরিয়ে নেওয়া হোক্। কিন্তু কূট সত্যই কূটকৌশলী ছিলেন। তিনি মনের কথা গোপন করে বললেন, "ইংরেজ সৈন্য নবাবেরই অধীন। নবাবের আদেশ পালন করতে সব সময় প্রস্তুত, অতএব তারা ফটকে থাকলে আর ক্ষতি কি?" মীরকাশেম নিজের সম্মান নষ্ট করতে চাইলেন না। তিনি পাটনা দুর্গে প্রবেশ করলেন না। কর্ণেল কূটের

মেজাজ তখন বেজায় গরম হ'য়ে গেল। একদিন অতি প্রত্যূষে কর্ণেল একদল 'সশস্ত্র অনুচর সহ নবাবের শিবিরে উপস্থিত হ'লেন। তখনও নবাব ঘুম থেকে ওঠেন নি। কর্ণেল পিস্তল হাতে ঘোড়া থেকে নেবেই গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"নবাব কোথায়?" তারপর অতি অল্প সময় অপেক্ষা করেই কর্ণেল ফিরে এলেন। এই ব্যাপারে মীরকাশেম অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন এবং কলকাতার প্রেসিডেণ্ট ভ্যান্সিটার্টের কাছে কূটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। ভ্যান্সিটার্ট বুঝলেন যে, ইংরেজ সেনাপতিরা নবাবের সংগে একটা সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টায় আছে। ভ্যান্সিটার্টের কিন্তু প্রথম থেকেই মীরকাশেমের ওপর ভাল ধারণা ছিল। তাই তিনি কূট ও কার্ণাককে বিহার থেকে কলকাতায় আনলেন। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে মীরকাশেমের ধারণা বদ্ধমূল হ'তে লাগল যে, ইংরেজকে বংগ-বিহার থেকে বিদূরিত না করতে পারলে কোন মঙ্গল নাই।

মীরকাশেমের নতুন কর্মপ্রণালী

এইবার মীরকাশেম ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করবার সব আয়োজন করতে লেগে গেলেন। মুর্শিদাবাদে রাজধানী রেখে নিজের ইচ্ছামত সব কাজ করতে সুবিধা হবে না—এই কথা ভেবে তিনি মুংগেরের পুরাতন দুর্গে বাস করবার সংকল্প করলেন; সংগে সংগে দুর্গের সংস্কার আরম্ভ হ'ল। কিছুদিন পরেই মুংগের বংগ-বিহারের রাজধানী হ'য়ে গেল।

মীরকাশেম গোপনে অনেক ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন। তা'ছাড়া মুংগের দুর্গে দেশী ও বিদেশী সুদক্ষ কর্মকার ও শিল্পীদের সাহায্যে গুলী গোলা বারুদ কামান আর বন্দুক তৈরী হ'তে লাগল। এই সব কামান-বন্দুকের কাছে ইউরোপের কামান-বন্দুক হার মেনে গেল। তখনকার দিনে আগুন দিয়ে কামান দাগা হ'ত। আর চক্‌মকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বেলে বন্দুক ছোড়া হ'ত। সুতরাং, উৎকৃষ্ট লোহা না হ'লে বন্দুক তৈরী হ'ত না। সেজন্য নাগপুরের লোহা খুব ব্যবহার হ'তে লাগল, আগুন জ্বালাবার জন্য রাজমহল পাহাড়ের চকমকি খুব কাজে লাগতে লাগল। মীরকাশেম সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধের আয়োজন করতে লেগে গেলেন।

নবাব ইউরোপীয় প্রণালীতে দেশীয় লোকদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য জার্মান্ সমরু ও আর্মানী গুর্গিন, মার্কার প্রভৃতি বিদেশী শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ সৈন্যদল গঠন করা এবং সিপাহীদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া চলতে লাগল। কিছু কিছু বিদেশী সৈনিকও নবাবের সেনাদলে যোগ দিল। প্রত্যেক ছোট ছোট দলে কিছু কিছু বলশালী জমকাল চেহারার লোক রাখা হ'তে লাগল। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন সৈন্য পলায়নের চেষ্টা করে, তবে এই সকল লোকদের কাজ হবে তা'দিগকে নিহত করা। গুর্গিন খাঁ হলেন প্রধান সেনাপতি ও যুদ্ধমন্ত্রী। তাঁরই পরিচালনায় নবাব সৈন্যের সামরিক শিক্ষা চলতে লাগল। মোগল সেনাপতিরাই অশ্বারোহীদলের নায়ক হ'লেন। আর্মানী ও ইউরোপীয়রা তোপবিভাগের ভার গ্রহণ করলেন। এইভাবে মীরকাশেম তাঁর যুদ্ধের আয়োজনকে সর্বাংগসুন্দর করে তোলবার কোন চেষ্টা বাকী রাখলেন না। সংগে সংগে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি রাজকোষ পূর্ণ করলেন। ইংরেজ বিতাড়ন তাঁর হৃদয়ের একমাত্র চিন্তা হ'য়ে দাঁড়াল। তিনি বাংলা-বিহারকে ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত করবার ব্রত গ্রহণ করলেন।

ইংরেজরাও সমস্ত ব্যাপার ক্রমশঃ বুঝতে পারল। সৈন্য সংগ্রহ আর অস্ত্র নির্মাণের বিষয় জান্তে তাদের বেশী দেরী হ'ল না। ইংরেজরাও ভিতরে ভিতরে পূরামাত্রায় যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হ'তে লাগল। এই রকম করে দুই পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন সব পূরোদমে চলতে লাগল। যেন বারুদখানা তৈরী, খালি একখানা দেশলাই কাঠি জ্বাললেই বিস্ফোরণ হয়।

মীরকাশেম জানতেন যে, জগৎশেঠেরা চিরদিন ইংরেজদের মিত্র। ইংরেজের সংগে যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে তাঁরা ইংরেজ পক্ষে যোগ দেবেন। তাই তিনি মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠকে মুর্শিদাবাদ থেকে মুংগেরে আনিয়ে সেখানেই বাস করতে বাধ্য করলেন। রাজা রামনারায়ণ, রাজবল্লভ এবং কৃষ্ণচন্দ্রকেও নবাব মুংগেরে বাস করতে বাধ্য করেছিলেন।

তাঁরা সকলেই বুঝলেন যে, তাঁরা নবাবের বন্দী।

শুল্ক রহিত



এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীরা শুল্ক না দেওয়ায় দেশীয় বণিকদের দারুণ ক্ষতি হ'তে লাগল। তা'ছাড়া নবাবেরও যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে লাগল। নবাব বার বার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের কাছে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। তখন ভ্যান্সিটার্ট মীমাংসার শেষ চেষ্টা করবার জন্য মুংগেরে এলেন। নবাবের সংগে তাঁর আলোচনাদি হওয়ার পর ভ্যান্সিটার্ট মীমাংসা করে

গেলেন যে, ইংরেজ কর্মচারীরা শতকরা নয় টাকা শুল্ক দিবে, আর তিনি এমন ব্যবস্থাও করে গেলেন, যাতে তারা জাল দস্তক ব্যবহার করতে না পারে।

মীমাংসার সর্তগুলি মীরকাশেম রাজ্যমধ্যে প্রচার করে দিলেন; কিন্তু কলকাতার ইংরেজ দরবার এই মীমাংসায় একেবারে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা বল্‌লেন—ইংরেজরা কিছুতেই শুল্ক দিবে না, যদি দিতে হয়, তবে তারা কেবলমাত্র লবণের বাণিজ্যে শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক দিতে পারে। নবাবের কর্মচারীরা নবাবের আদেশে ইংরেজদের কাছ থেকে শুল্ক দাবী ক'রল, কিন্তু তারা শুল্ক দিতে রাজী হ'ল না। তখন ইংরেজদের নৌকা আটক করা হ'ল। এই সংবাদে ইংরেজরা ক্ষেপে আগুন হ'য়ে গেল। নবাব তখন অন্য উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি দেশী-বিদেশী কোন বণিকের কাছ থেকে শুল্ক নেবেন না। এই মর্মে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তিনি ঘোষণা করলেন।

অমনি দেশীয় বণিকদের আনন্দের সীমা থাকল না। এতদিন তারা ইংরেজ বণিকের সংগে পাল্লা দিয়ে পারত না। কারণ, ইংরেজরা শুল্ক দিত না, আর দেশীয় বণিকদিগকে শুল্ক দিতে হ'ত। সুতরাং, একটু বেশী দামে মাল বিক্রী না করলে লাভ করা যেত না; এখন সেই প্রতিযোগিতা বন্ধ হ'য়ে গেল। দেশীয় ব্যবসাদাররা ইংরেজদের সমকক্ষ হ'য়ে দাঁড়াল। ইংরেজরা যে দামে মাল বিক্রী করে, তারা সেই

দামে বা আরও কম দামে মাল বিক্রী করতে সক্ষম হ'ল। এতে ইংরেজদের হ'ল গাত্রদাহ।

ইংরেজ দরবারে গণ্ডগোল পড়ে গেল। চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ইংরেজরা বার বার দাবী করতে লাগলেন যে, নবাব মীরকাশেমের শুল্ক তুলে দেওয়ার অধিকার নেই। শুল্ক তুলে দিয়ে তিনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। তারপর তাঁরা স্থির করলেন যে, ইংরেজদের আর চুপ ক'রে বসে থাকলে চল্‌বে না, এখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই একমাত্র কর্তব্য। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টও শেষ পর্যন্ত এই কথায় রাজী হ'লেন। আবার বাংলার আকাশ দুর্দিনের ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে এল'। বাঙালীর ভাগ্যে সুখশান্তি নাই; তার স্বদেশে বিদেশীকেই বিশেষ অধিকার দিতে হবে। তার ফলে বাঙালীর সর্বনাশ হয় হোক, তাকে পথের কাঙাল হ'তে হয় হোক্, তবুও ইংরেজের আইনে সেইটা হ'ল ন্যায়।



যুদ্ধের ঘনঘটা

ইংরেজরা একবাক্যে স্থির করলেন যে, মীরকাশেম তাঁদের পরম শত্রু। তাঁকে বাংলার সিংহাসন থেকে অপসারিত করতেই হবে। সুতরাং যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চলতে লাগল। তবে যদি ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার হয়, সেই উদ্দেশ্যে মিঃ আমিয়ট ও মিঃ হে নামে দু'জন ইংরেজকে মুংগেরে নবাব দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁরা মুংগেরে গিয়ে নবাবের সংগে শান্তির আলোচনা করতে লাগলেন। অন্যদিকে ইংরেজদের প্রেরিত সিপাহীরা গুলীগোলা ভর্তি ক'রে কয়েকটি নৌকা নিয়ে পাটনার দিকে অগ্রসর হ'ল। নবাব এ নৌকাগুলি আটক করলেন, আর তার প্রতিবাদ কববার জন্য কলকাতায় দূত পাঠালেন। নবাব শান্তিদূত আমিয়ট ও হে-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং প্রজাদের দুঃখ দূর করবার জন্যই শুল্ক প্রত্যাহার করেছেন।

পাটনায় ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ইলিস সাহেব ভালভাবেই যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন। তিনি নবাবের পাটনা দুর্গ আক্রমণ করবার সব ব্যবস্থা ক'রে অপেক্ষা করছিলেন। এদিকে

নবাবের দূত কলকাতা থেকেও ফিরে আস্‌চেন না। এ'জন্য নবাব আমিয়টকে কলকাতায় পাঠালেন। কিন্তু হে সাহেবকে মুংগেরে থাক্‌তে বাধ্য করা হ'ল।

ইংরেজরা গোপনে আমিয়ট ও হে-কে মুংগের থেকে ২৩শে জুন পালিয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইলিসের উপর আদেশ দেওয়া ছিল যে, আমিয়ট ও হে মুংগের ত্যাগ ক'রলেই ইলিস পাটনার দুর্গ আক্রমণ করবে। ওদিকে পাটনায় ইংরেজদের তোড়যোড় দেখে নবাব পাটনার দুর্গরক্ষার জন্য মার্কারকে সসৈন্যে পাঠালেন।

ইলিস সাহেব দেখলেন যে, মার্কার পাটনায় পৌঁছাবার পূর্বেই দুর্গ আক্রমণ করা সুবিধাজনক। তাঁর ধারণা ছিল যে, ২৩শে জুন আমিয়ট ও হে মুংগের ত্যাগ করবেন। অতএব সেই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তিনি গোপনে সেই দিন রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই অকস্মাৎ পাটনা নগর ও দুর্গ আক্রমণ করলেন। তারপর পাটনা নগরে আরম্ভ হ'ল লুণ্ঠন আর নরহত্যা। নিরীহ নগরবাসীদের হত্যা ক'রে, তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে ইলিস সাহেবের সৈন্যেরা বর্বরতার চূড়ান্ত ক'রল। কিন্তু তারা দুর্গ দখল ক'রতে পারল' না। লালসিংহ নামে এক নবাব সেনানীর বীরত্বে ইলিস সাহেবের সৈন্যদল হঠাৎ কাজ হাসিল ক'রতে পারলে না। ইতিমধ্যে নবাবের আর্মানী সেনাপতি মার্কারের সৈন্যদল এসে প'ড়ল। নবাব সৈন্য অতি সহজেই নগর হস্তগত করল।

তারপর মার্কার ইংরেজ-কুঠি আক্রমণ করলেন। ইলিস সাহেব দেখলেন, এখন পলায়ন ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পূর্ব দিকে পলায়ন করলে মুংগেরের কাছে ধরা প'ড়তে হবে। অতএব তিনি পশ্চিম দিকে পলায়ন করলেন। কিন্তু মার্কারের সৈন্য গিয়ে পথ আটকাল'। তার ফলে হ'ল যুদ্ধ। অনেক ইংরেজ মারা গেল। আর বাকী ইংরেজ অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে প্রাণভিক্ষা চাইল'। ইলিস সাহেব সহ বাকী ইংরেজরা বন্দী হ'লেন, তাঁদের সিপাহী সৈন্যরা নবাব সৈন্যদলে যোগ দিল।

এই যুদ্ধের পর মীরকাশেম কলকাতার ইংরেজদের নিকট পত্র লিখে জানালেন যে, "ইংরেজ সেনাপতি মিঃ ইলিস চোরের মত নগর ও দুর্গ আক্রমণ ক'রে বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত অধিবাসীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে লোকজনকে নিহত ক'রেছেন। কোম্পানীর নৌকা থেকে আপনারা দু' তিন শত মাত্র বন্দুক আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী হন নাই ; এখন আমার পরম বন্ধু মিঃ ইলিস তাঁর সৈন্যদলের সমস্ত কামান-বন্দুক আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। কোম্পানীর ক্ষতি ক'রবার ইচ্ছা আমার কখনো ছিল না। আপনারাই এর জন্য দায়ী। কলকাতা লুণ্ঠনের জন্য নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট আপনারা ক্ষতিপূরণ দাবী করেছিলেন। পাটনার দরিদ্র অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ করা কোম্পানীর অবশ্য কর্তব্য। আপনারা আশ্চর্য ধরণের বন্ধু। যীশুখৃষ্টের নামে সন্ধি ক'রে আমার সাহায্যের জন্য আমার রাজ্যে বৃটিশ সেনাদল পাঠিয়েছেন ; আর তাদের

খরচের দরুণ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—তিনটি জেলা গ্রহণ করেছেন! এখন দেখ্‌ছি, আমার ধ্বংসের জন্য আপনারা সেই সেনাদল ব্যবহার করেছেন। অতএব, এই তিন বছরের তিনটি জেলার রাজকর আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া আপনাদের উচিত। আপনাদের ইংরেজ গোমস্তারা আমার রাজ্যের যে ক্ষতি সাধন করেছেন, তারও ক্ষতিপূরণ দেওয়া কর্তব্য। এখন আপনারা অবিলম্বে এই তিনটি জেলা ত্যাগ করুন।”

এদিকে আমিয়ট সাহেব আরও সাত আট জন ইংরেজ সহ মুংগের থেকে নৌকাযোগে কলকাতা যাচ্ছিলেন। নবাবের সিপাহীরা মুর্শিদাবাদের নিকট তাঁর নৌকা আটক ক'রল। আমিয়ট সাহেবকে তীরে অবতরণ করতে বলায় তিনি তাঁর সিপাহীদিগকে বন্দুক ছুড়বার আদেশ দিলেন। ফলে উভয়পক্ষে গুলী ছোড়া-ছুড়ি আরম্ভ হ'য়ে গেল। আমিয়টের দলে অল্প লোকই ছিল। অতএব আমিয়ট এবং সমস্ত ইংরেজরা নিহত হ'লেন। মাত্র দু' একজন সিপাহীর কোনক্রমে প্রাণ বেঁচে গেল। আমিয়ট গুলী ছুড়বার আদেশ না দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।

কলকাতার ইংরেজরা যখন পাটনা ও মুর্শিদাবাদের সংবাদ পেলেন, তখন তাঁদের মধ্যে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল। মীরকাশেমকে নবাবী দিয়ে তাঁরা যে খাল কেটে কুমীর এনেছেন, একথা তাঁরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন। এখন তাঁরা স্থির করলেন যে, অতিবৃদ্ধ মীরজাফরকেই পুনরায় বাঙলার

মসনদে বসাবেন, আর মীরকাশেমকে চিরতরে উৎখাত করবেন।

মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান' ছাড়া ইংরেজদের আর উপায় ছিল না। তাই তাঁরা অতিবৃদ্ধ জরাজীর্ণ মীরজাফরকেই বাঙ্‌লার নবাব বলে ঘোষণা করলেন। মীরজাফরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি কোম্পানীকে ৩০ লক্ষ টাকা ও ইংরেজ সৈন্যদের জন্য ৩৭॥ লক্ষ টাকা দিবেন, আর ইংরেজদিগকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে দিবেন, কিন্তু দেশীয় বণিকদিগকে শুল্ক দিতে হবে। মীরকাশেমের মত তিনিও কোম্পানীকে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই তিনটি জেলা অর্পণ করলেন। স্থির হ'ল—পূর্ণিয়ার অর্ধেক সোরা কোম্পানী পাবেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কোম্পানী শ্রীহট্টে প্রস্তুত চূণের অর্ধেক পাবেন। এইভাবে দেশের সর্বনাশের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ক'রে মীরজাফর আবার মসনদে বসলেন।

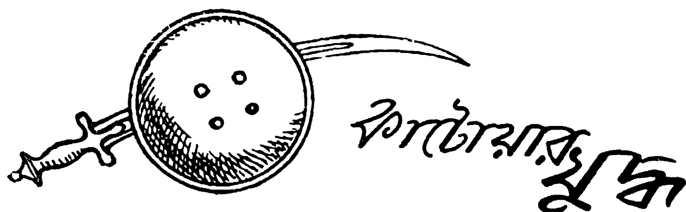
এই সব চুক্তি সমাপ্ত করেই ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সৈন্যদল প্রেরণ করল। সেনাপতি গ্লেন সেই দলের অধ্যক্ষ, আর সংগে চললেন নবনিযুক্ত নবাব মীরজাফর। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ মহম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। জাফর খাঁ, আলম খাঁ আর হায়বৎ উল্লা নামে তিনজন সেনাপতি তাঁকে সাহায্য করতে এলেন। তাঁরা এসেই প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি

অবরোধ করলেন। সহজেই দুর্গস্থ ইংরেজরা বশ্যতা স্বীকার করলেন। তাঁ'দিগকে বন্দী ক'রে পাটনায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

নবাব মীরকাশেম অতি বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন। তিনি নিজের সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে পারেন নি। তাই তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে মুংগেরে বসেই প্রধান সেনাপতি গুর্গিন খাঁর সংগে যুদ্ধের পরামর্শ করতেন। তাঁদের উপদেশ অনুসারেই সর্বত্র যুদ্ধের ব্যবস্থা হ'তে লাগল।

ইংরেজদের যান-বাহনের অভাবে সিপাহীরাই রসদ, সাজসজ্জা বয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ভাগীরথীর তীর ধরে ক্রমশঃ মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হ'ল।

———



ইংরেজ সৈন্যগণ অগ্রসর হ'তে হ'তে হঠাৎ বাধা পেল অজয় নদীর তীরে। সেখানে জাফর খাঁ, আলম খাঁ, হায়বৎ উল্লার সৈন্যগণ ইংরেজের পথ আগলে দাঁড়াল। ইংরেজ সেনাপতি গ্লেন দেখলেন—মহা বিপদ উপস্থিত। চারিদিকে নবাব সৈন্য ছেয়ে আছে। তাদের সংগে অল্প সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে

হলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। তবে গ্লেনের সংগে ছিল কতকগুলি কামান, আর নবাব সৈন্যের সংগে কামান আদৌ ছিল না। উভয়পক্ষে বীরবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। নবাব সৈন্য বিনা কামানে যুদ্ধ করলেও তিন তিন বার ইংরেজের কামান কেড়ে নিতে সক্ষম হ'য়েছিল। তিন তিন বার ইংরেজরা ফাঁপরে পড়েছিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের সিপাহী সৈন্যরাই সেই কামানগুলি উদ্ধার ক'রে ইংরেজ গোলন্দাজদের হাতে এনে তুলে দিয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত ইংরেজের কামানের সামনে নবাব সৈন্য টিকে থাকতে পারল না। ইংরেজের জয় হ'ল। বহু নবাব সৈন্য হতাহত হল। বাকী সৈন্যেরা নিরুপায় হ'য়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ল।

এই রকম করে সমস্ত যুদ্ধেই ইংরেজরা দেশীয় সৈন্যদের সাহায্য নিয়েই জয়লাভ করেছে, আর ভারতকে পদানত করেছে। তারা যে ভারতকে শাসন করেছে, তাও দেশীয় কর্মচারীর সাহায্যেই। ভারতকে বিদেশী আক্রমণ হ'তে রক্ষা ক'রেছে ব'লে ইংরেজরা গর্ব করে; সেও ভারতীয় সৈন্যের বীরত্ব ও যোগ্যতার ফলে। সোজা কথা, ভারতের লোক সাহায্য না ক'রলে ইংরেজের একদিনের জন্যও ভারতে থাকা অসম্ভব হ'ত।

গ্লেন এই যুদ্ধের পর আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। এবার ভাগীরথীর পূর্বতীরে পলাশীর দক্ষিণে ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন—মীরকাশেমের

অশ্বারোহী সৈন্যদলের সেনানায়ক মহম্মদ তকী খাঁ। তকী খাঁ একজন শ্রেষ্ঠ বীর ; আর তিনি ছিলেন মীরকাশেমের একান্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি। তকী খাঁর সৈন্যদলের সংগে কোম্পানীর সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেল। গ্লেনের সৈন্যরা গত যুদ্ধজয়ের আনন্দে নবীন উৎসাহে তকী খাঁর সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তকী খাঁর রোহিলা ও আফগান সৈন্যরাও পিছু হটবার লোক ছিল না। তারাও সিংহবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে জয়-পরাজয়কে অনিশ্চিত করে তুল্‌ল। হঠাৎ একটা কামানের গোলা এসে তকী খাঁর পায়ে লাগ্‌ল। সংগে সংগে সেই গোলার আঘাতে তকী খাঁর ঘোড়াটী নিহত হ'য়ে মাটিতে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল। বীর তকী খাঁ ভ্রূক্ষেপ না করে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আর একটী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে অজস্র রক্ত প্রবাহিত হ'চ্ছে, আর তিনি অমিতবিক্রমে সৈন্য চালনা করছেন, এমন সময় একটি বন্দুকের গুলী তাঁর স্কন্ধদেশ ভেদ করে বেরিয়ে চলে গেল। যখন রক্তধারায় তাঁর গাত্রাবরণ রঞ্জিত হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল, তখন তিনি বস্ত্র দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর একজন অনুচর বল্‌লেন "প্রবল রক্তস্রাব হ'চ্ছে, এখন ফিরে চলুন।" তকী খাঁ গর্জন করে উঠলেন "ফিরে যাব ? নবাবকে এই কৃষ্ণ শ্মশ্রু দেখাবার জন্য ফিরে যাবো ? অসম্ভব এখন আমাদের দ্রুত অগ্রসর হবার সময়, ফিরে যাওয়ার সময় নয়।" তাঁর আদেশে নবাব সৈন্য অগ্রসর হ'তে লাগল। ইংরেজ সৈন্য নবাব সৈন্যের

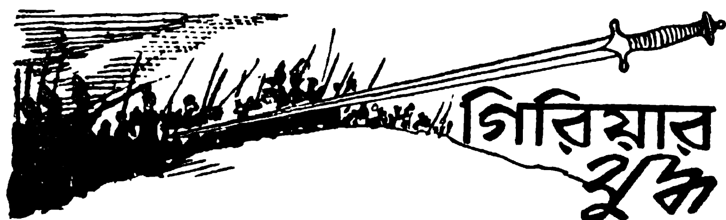
আক্রমণে একেবারে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ল'। তারা বুঝল— তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত ; সুতরাং, তারা পিছু হটতে লাগল। কিন্তু এই পালাবার পথেই জনকয়েক একটা ছোট নদীর খাতে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকল'। তকী খাঁ পলায়মান শত্রুর পশ্চাৎ ধাবিত হ'লেন। কিন্তু কয়েকজন শত্রুসৈন্য যে পথিমধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে, তা' তিনি বুঝতে পারেন নি। তারা হঠাৎ গুপ্তস্থান হ'তে বেরিয়ে তকী খাঁকে লক্ষ্য করে অজস্র গুলী বর্ষণ করতে লাগল। একটি গুলী তকী খাঁর কপাল ভেদ করে মাথার ভিতর প্রবেশ করল ; তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে নিক্ষিপ্ত হ'লেন। অবিলম্বে বীর সেনানীর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হ'য়ে গেল।

তকী খাঁর সৈন্যগণ মরিয়া হ'য়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল। ইংরেজ সৈন্য তখন বিপুল উৎসাহে যুদ্ধ করতে সুরু করেছে; আর নবাব সৈন্য নেতৃবিহীন হ'য়ে কতক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ চালাতে পারে? তারা ক্রমশঃ অবসন্ন ও উৎসাহহীন হ'য়ে পড়ল, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যের জয় হ'ল।

এ যুদ্ধে ইংরেজ ভাগ্যক্রমেই জয়লাভ করেছে। এ বিজয়ে তাদের কোন কৃতিত্ব নাই ; বরং তকী খাঁর নাম চিরদিন গৌরবোজ্জ্বল হ'য়ে থেকে যাবে। দেহ থেকে অজস্র রক্ত ক্ষরণ হ'চ্ছে, গুলী গোলার আঘাতে দেহের তুই তিন স্থানে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হ'য়েছেন। তথাপি তিনি কোন রকমেই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেননি ; প্রকৃত বীরের মত তিনি

যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছেন। বীরত্বের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন অমর হ'য়ে থাকবে।

এই যুদ্ধের ফলে নবাব মীরকাশেম প্রমাদ গণলেন। তকী খাঁর স্থান গ্রহণ করতে পারে, এমন অশ্বারোহী সেনাপতি মীরকাশেমের ছিল না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইতিমধ্যেই তাঁর অনেক শক্তি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হ'লেন না। তখনও যা' সম্বল ছিল, তাই নিয়ে তিনি ইংরেজকে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলেন। জাতির ও দেশের শত্রুকে নিপাত করা চাই— এই হল তাঁর দৃঢ় পণ, সেই দৃঢ় পণ নিয়ে তিনি গুর্গিন খাঁর সংগে পরবর্তী পন্থা স্থির করতে লেগে গেলেন।



কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজদের বুকের পাটা বেড়ে গেল। তা'রা কাটোয়ার দুর্গ দখল করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হ'ল। নবাব সেনা মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য অতি অল্পই যুদ্ধ করেছিল। মুর্শিদাবাদের শাসনকর্তা নগর ছেড়ে

পালিয়ে গেলেন। ইংরেজ সেনা মুর্শিদাবাদে প্রবেশ ক'রল। মতিঝিল প্রাসাদ ইংরেজের গোলায় ভেংগে চূরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল। তারপর কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজরা আবার দখল করল। বৃদ্ধ মীরজাফর আবার মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসলেন। আবার পাত্রমিত্র তাঁকে ঘিরে বসল।

এদিকে নবাব সেনা গিরিয়া নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকল। মীরকাশেমের ইচ্ছা এই যে, এইখানেই তিনি ইংরেজদিগকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে বাধা দিবেন। এই উদ্দেশ্যে নবাব সৈন্য ছাউনি ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হ'চ্ছে. এই সংবাদ পেয়ে নবাব সৈন্য সুরক্ষিত ছাউনি ত্যাগ করে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে লাগল। ২রা আগষ্ট উভয় পক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ল।

নবাব পক্ষে আর্মেনীয় মার্কার, সমরু ও মুসলমান মীর আসদ্দৌলা বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। মীর নাসির ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর নায়ক। আসদ্দৌলার অধীনে অশ্বারোহী দলের নায়ক ছিলেন মীর বদরুদ্দিন। তা' ছাড়া ২০০ ইউরোপীয় সৈন্য নবাবের পক্ষে ছিলেন। এই যুদ্ধে মার্কার ও সমরু বিশেষ দক্ষতা বা শৌর্যবীর্য দেখাতে পারেননি। প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধ করেছিলেন মীর বদরুদ্দিন। তাঁর আক্রমণে ইংরেজরা বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। অনেক ইংরেজ বাঁশলী নালার জলে ডুবে মারা পড়েছিল। কাপ্তেন ষ্টিবার্টের সৈন্যদের দুরবস্থার একশেষ হ'য়েছিল। দু'দিক থেকে

মীর বদরুদ্দিন আর মীর নাসির ইংরেজদলকে আক্রমণ করায় তারা দু'টি কামান পর্যন্ত ছেড়ে পালাতে বাধ্য হ'য়েছিল। কিন্তু নবাব সেনার এত দুর্ভাগ্য যে, এই সাংঘাতিক সময়েই বদরুদ্দিন আহত হ'লেন। এমন সময় ইংরেজ সেনাপতি মেজর আদামস্ সবলে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ ক'রলেন। সে আক্রমণের মুখে মার্কার ও সমরু পিছু হটে গেলেন। নবাব সেনাপতি শের আলির বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবপক্ষের সর্বনাশ হ'ল। তা ছাড়া ২০০ ইউরোপীয় গোলন্দাজ ইংরেজের দুর্দশা দেখে বিচলিত হ'য়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ইংরেজপক্ষে যোগ দিয়েছিল। এইসব কারণে এই যুদ্ধে ইংরেজরাই জয়ী হ'ল। গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজয় হতভাগ্য মীরকাশেমের যুদ্ধজয়ের আশা-ভরসাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিয়েছিল। ইংরেজরা মীরকাশেমের ১৭টী কামান ও ১৫০টী নৌকা বোঝাই খাদ্যশস্য অধিকার করেছিল। ইংরেজদলে হতাহত হ'য়েছিল অনেক। কিন্তু মীরজাফরের সৈন্যদল ও বর্ধমানের সিপাহীরা এসে তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ ক'রল।

এখন মীরকাশেম বুঝলেন—অবস্থা সঙ্গীন। তিনি মীর সুলেমান ও নবৎরায়ের সংগে তাঁর মূল্যবান সম্পত্তি ও বেগম-গণকে রোটাশ দুর্গে স্থানান্তরিত করলেন।

উধূয়ানালার যুদ্ধ

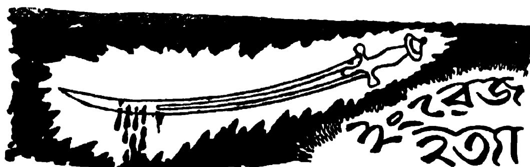
উধূয়ানালায় মীরকাশেমের সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। একদিকে ভাগীরথী নদী আর অন্য দিকে উধূয়ার গিরি-সংকট। দুর্গের চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর ; তার চারিদিকে ৬০ ফুট চওড়া ১০ফুট উঁচু মাটীর প্রাচীর আর প্রাচীরের বাইরে গভীর জলাভূমি। গিরিয়ার যুদ্ধের পর মীরকাশেমের সৈন্যগণ উধূয়ানালার দুর্গে জমায়েৎ হ'ল। ৪০০০০ সৈন্য যুদ্ধের জন্য বেশ ভালভাবে প্রস্তুত হ'য়ে রইল।

এদিকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর এডামস্ উধূয়ানালার দুর্গ দখল করবার উদ্দেশ্যে চার মাইল দূরে পাল্কীপুর গ্রামে ছাউনি ফেললেন। তারপর সেখান থেকে অগ্রসর হ'য়ে ক্রমশঃ দুর্গের সম্মুখীন হ'তে লাগলেন। এডাম্স্ দেখলেন, দুর্গটী সুরক্ষিত। দুর্গের বাইরে ও পাহাড়ে সারি সারি কামান সাজান রয়েছে। এক মাত্র গংগাতীর ছাড়া অন্যদিক দিয়ে দুর্গ আক্রমণ অসম্ভব। সুতরাং, তাঁর আদেশে সৈন্যরা নৌকা থেকে নদীতীরে কামান নাবাতে আরম্ভ করল। দুর্গের প্রাচীর থেকে নবাব সৈন্যরা বাধা দেওয়ার জন্য কামান দাগতে লাগল, অ

গুলীবর্ষণও চল্‌ল। এডামস্ ভাগীরথীর তীরে পৌছেই তোপ দাগবার জন্য মঞ্চ তৈরী ক'রতে আদেশ দিলেন। আর নবাবের সিপাহীরা তোপমঞ্চ লক্ষ্য করে অজস্র গুলীবর্ষণ করতে লাগ্‌ল। এই সংকটের মধ্য দিয়ে তিন সপ্তাহ ধরে মাত্র তিনটী তোপমঞ্চ বাঁধা হল। মঞ্চ থেকে তোপ দাগাও আরম্ভ হ'ল। কিন্তু ইংরেজের গোলায় নবাব দুর্গ-প্রাচীরের কোন ক্ষতি হ'ল না। বরং নবাবের সেনারা মাঝে মাঝে রাত্রিতে বিলের অগভীর অংশ পার হ'য়ে ইংরেজ সৈন্যকে সহসা আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ল। তখন ইংরেজরা কোন বকমে দুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করবার ফন্দি আঁটতে লাগল। কিন্তু গভীর জলাভুমি পার হ'য়ে দুর্গ-প্রাচীরের নিকট পৌছানই অসম্ভব বোধ হ'তে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা যেন নিরস্ত হ'য়ে পড়্‌ল; অন্ততঃ নিরস্ত হবার ভাণ দেখাতে লাগল। নবাব সেনার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়ে গেল, এ হেন দুর্গ দখল করা ইংরেজের সাধ্য নয়। দুর্গমধ্যে নৃত্যগীত আনন্দোৎসব আরম্ভ হ'য়ে গেল। কৌশলী ইংরেজ এ সুযোগ হারাল না।

একজন ইংরেজ সৈনিক কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে ইতিপূর্বে নবাবের আশ্রয় নিয়েছিল। সে এতদিন নবাবের সৈন্যদলেই কাজ কচ্ছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে নবাবের দুর্গ ত্যাগ করে সেই বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ শিবিরে গিয়ে সংবাদ দিয়ে এল যে, জলাভূমির একটা জায়গা বেশ অগভীর; সেখান দিয়ে অক্লেশে হেঁটে পার হওয়া যেতে পারে। এই সংবাদ জানতে

পেরেই রাত্রিতে ইংরেজ সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র মাথায় নিয়ে অগভীর অংশ দিয়ে জলাভূমি পার হ'য়ে দুর্গ-প্রাচীরের নিকট পৌঁছিল। তখন দুর্গের বাইরে যে সৈন্যরা রক্ষীর কাজ কচ্ছিল, তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ইংরেজ সৈন্য তা'দিগকে হত্যা করে প্রাচীর টপ্‌কিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রল। নবাব সৈন্য জেগে উঠে দেখ্‌ল'—মহাবিপদ উপস্থিত। তারা পলায়ন করতে লাগল। নবাবের সেনানীরা দেখলেন—এখন সিপাহীদিগকে ফিরাতে না পারলে জয়ের আশা নাই। তাই তাঁরা পথ আগ্‌লিয়ে দাঁড়ালেন আর ঘোষণা করলেন "হয় বিজয় নয় মরণ; আমরা কেউ পিছু হট্‌ব না; কাউকে পিছু হট্‌তেও দেব না; যে পিছু হট্‌বে, তার উপর গুলী চালনা হবে—সে দেশের শত্রু। কিন্তু সাধারণ সৈন্যরা ইংরেজ সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে মনের বল হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করবারও সুযোগ ছিল না। তারা দুর্গ ত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগল। আর নবাব-সেনাপতির আদেশে নবাবের লোকেরাই পলায়নপর সৈন্যদিগকে গুলী করে মারতে লাগল। এই প্রকারে শত্রু-মিত্র উভয়ের আক্রমণে পনের হাজার নবাব সৈন্য নিহত হ'ল। সমরু, মার্কার প্রভৃতি আর্মেনীয় সেনাপতিরা পলায়ন করলেন। ইংরেজদের জয়জয়কার হ'য়ে গেল। চিরতরে নবাবের জয়ের আশা ভাগীরথীর জলে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। উধুয়ানালার দুর্গের পতনের সংগে সংগে নবাবের শেষ আশাটুকুও বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।



উধূয়ানালার যুদ্ধে হেরে মীরকাশেম ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে উঠলেন। সমস্ত বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি ইংরেজ সেনাপতি এড্যামসকে চিঠি লিখে জানালেন—তিনি পাটনার বন্দী ইংরেজ নরনারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিবেন। এড্যাম্‌স তার প্রত্যুত্তরে জানালেন—যদি বন্দী ইংরেজদের কেশাগ্র স্পর্শ করা হয় তবে মীরকাশেমের অস্তিত্ব থাকবে না; পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার অনুসরণ করে ইংরেজ সেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। এড্যামসের লক্ষ্য হল—তাড়াতাড়ি মুংগের দুর্গ দখল করে নিয়ে পাটনায় উপস্থিত হওয়া। সেই উদ্দেশ্যে তিনি দ্রুত সসৈন্যে মুংগেরের দিকে ধাবিত হ'লেন।

এদিকে মীরকাশেম একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রথমেই বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি গুর্গিন খাঁর নিধনের ব্যবস্থা করলেন। গুর্গিন খাঁর দেহরক্ষীরাই বিদ্রোহী হ'য়ে সেনাপতির ইহলীলা শেষ করেছিল। তারপর রাজা রামনারায়ণ, জগৎশেঠদ্বয়, রাজা রাজবল্লভ, বিহারের জমিদার-

গণ প্রভৃতি যা'দিগকে ইংরেজের মিত্র বলে মীরকাশেম সন্দেহ করতেন, তাঁদের সকলেরই হত্যার ব্যবস্থা হ'ল। হত্যার প্রণালীও বড় অদ্ভুত ধরণের। রাজা রামনারায়ণের গলায় বালিভরা কলসী বেঁধে গংগার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। শেঠ ভ্রাতৃযুগলকে মুংগের দুর্গের পাহাড় থেকে গংগাবক্ষে নিক্ষেপ করা হ'ল। এখন মীরকাশেম জগতে কাউকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর মনে হ'তে লাগল—সকলেই তাঁর শত্রু, সকলেই তাঁর সর্বনাশ ক'রতে উদ্যত। তিনি ন্যায় অন্যায় কর্তব্যাকর্তব্য শত্রুমিত্র সব ভুলে গেলেন। মুংগেরে দেশীয় শত্রুদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পাটনায় ইংরেজ নরনারীর হত্যার সংকল্প নিয়ে দ্রুত সেইদিকে ধাবিত হ'লেন। আবার আলি নামে একজন বিশ্বস্ত সেনাপতির উপর মুংগের দুর্গ রক্ষা করবার ভার অর্পিত হ'ল।

ইংরেজ সৈন্যগণ ১লা অক্টোবর মুংগেরে উপস্থিত হ'লেন। নয়দিন দুর্গ অবরোধের পর ইংরেজরা জয়ী হলেন, মুংগের দুর্গের পতন হ'ল। দুঃখের বিষয়, এই ব্যপারেও আবার আলি বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের হাতে মুংগের দুর্গ তুলে দিয়েছিলেন। আর পরিতাপের বিষয়, পরাজয়ের পর বহু নবাব সৈন্য ইংরেজ সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। এইসব সংবাদ যখন পাটনায় মীরকাশেমের কাণে পৌঁছল, তখন তিনি ক্রোধে ঘৃণায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়লেন। প্রতিশোধ-বহ্নি তাঁর প্রাণে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তিনি অবিলম্বে

ইংরেজ বন্দীদের মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিলেন। বন্দীর প্রাণ নাশ করা যে অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কর্ম, সে চিন্তা তাঁর হৃদয়ে স্থান পেল না। তাঁর অন্তর যেন মুহুর্মুহু ঘোষণা ক'রতে থাকল'—"চাই প্রতিহিংসা, চাই প্রতিহিংসা"।

অন্যদিকে আর এক দৃশ্য। মিঃ ইলিস প্রথম থেকেই মীরকাশেমের সংগে অন্যায় ব্যবহার করে এসেছেন। অনেকটা তাঁরই উত্তেজনা ও অবিবেচনার ফলে যুদ্ধ বেধেছিল। কিন্তু তাঁর ও অন্যান্য ইংরেজ বন্দীদের বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেমের প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। পাটনার ইংরেজ বন্দীরা যখন জানতে পারলেন যে, সেনাপতি এড্যাম্‌স তাঁদের প্রাণরক্ষার জন্য দ্রুত পাটনার দিকে ধাবিত হ'য়েছেন, তখন তাঁরা এড্যামসকে পত্রের দ্বারা জানালেন—আমরা সানন্দে মরণের জন্য প্রস্তুত, আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য যেন যুদ্ধ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করা না হয়—এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।" আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে যে জাতির নরনারী এমন করে জাতির মংগলের জন্য হাসিমুখে আত্মাহুতি দিতে পারে, সে জাতির খ্যাতি ও উন্নতি কেউ রোধ করতে পারে না। একদিকে মীরকাশেমের সেনাপতি, সৈন্য ও কর্মচারীরা বারে বারে পদে পদে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে দেশের ও জাতির সর্বনাশ সাধন করেছে; আর অন্যদিকে ইংরেজ নরনারী তাদের জাতির স্বার্থের জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিংগন করেছে। এই পার্থক্যের উপরেই ইংরেজের বিজয়-দুর্গ রচিত হ'য়েছে। চরিত্রের এই মহত্বের জন্যই আজ ইংরেজ জাতি জগতের এক শ্রেষ্ঠ জাতি।

নবাবের আদেশ—নিরস্ত্র বন্দী ইংরেজ নরনারী ও শিশুকে সংহার ক'রতে হবে, কারও প্রতি দয়া দেখান চলবে না—শিশুর প্রতিও নয়। এই নিদারুণ আদেশ পালন করতে সবাই হল সংকুচিত, ত্রস্ত। সকলের শরীর শিউরে উঠল, হৃদয় কেঁপে উঠল কিন্তু খৃষ্টান সমরু নিঃসংকোচে বলল,--"আমি নবাবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত।" ৫ই অক্টোবর পাশবিক হত্যার ভার নিয়ে সমরু তার সৈন্যদল সহ কারাকক্ষের দরজায় উপস্থিত হ'ল।

সমরু প্রথমেই ইলিস, হে ও লসিংটন সাহেবকে কারাকক্ষের বাইরে ডেকে পাঠালেন। এক একজন আস্তে লাগলেন আর অস্ত্রাঘাতে তাঁ'দিগকে নিহত করা হ'তে লাগল। এই সংবাদ যখন কারাকক্ষের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল তখন বন্দীরা শিশি, বোতল, চেয়ার, টেবিল, ছুরি, কাঁটা যে যা হাতের কাছে পেল, সে তাই নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। সমরুর সৈন্যরা আপত্তি করল, "নিরস্ত্র বন্দীদিগকে অস্ত্র দেওয়া হোক, আমরা যুদ্ধ করে সশস্ত্র শত্রুকে নিহত করতে রাজী আছি ; কিন্তু আমরা কশাই-এর মত নিরস্ত্র নরনারীকে জবাই করতে পারব' না।" যে সকল সৈন্য এই ভাবে আপত্তি জানাল, সমরু তা'দিগকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিতে লাগল। তখন সৈন্যরা তার আদেশ অনুসারে নির্বিচারে সকলকে হত্যা করতে লাগল। শিশু, স্ত্রীলোক পর্যন্ত বাদ পড়ল' না। একমাত্র ডাক্তার ফুলারটন সাহেব ছাড়া আর

সবাই নিহত হ'ল। ডাক্তার সাহেব মীরকাশেমের পরিচিত বলেই পরিত্রাণ পান। পরদিন সকালে সমস্ত মৃতদেহ একটি কূপে নিক্ষেপ করা হ'ল।

এই সংবাদ যথাসময়ে ক'লকাতায় পৌঁছল। সংবাদ পৌঁছান মাত্র ইংরেজ মহলে হাহাকার পড়ে গেল। তাঁরা মর্মান্তিক বেদনায় আর প্রতিহিংসায় ছট্‌ফট করতে লাগলেন। দরবারে ব'সে সকলে স্থির করলেন—সেদিন পূর্বাহ্নে কেউ খাদ্য গ্রহণ করবেন না, সকলে গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিবেন, আর এক পক্ষকাল তাঁরা শোকচিহ্ন ধারণ করবেন। দুষ্কৃতকারীদের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে এবং এইরূপ নিষ্ঠুরতার পুনরাবৃত্তি রোধ করবার জন্য প্রত্যেকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন। যে ব্যক্তি মীরকাশেমকে ধরে দিতে পারবে, তাকে তৎক্ষণাৎ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে—এই ঘোষণাও করা হ'ল।



ইংরেজদের পাটনা অধিকার

পাটনার হত্যাকাণ্ডের পর মীরকাশেম পাটনা-দুর্গ সুরক্ষিত করলেন। দুর্গ-প্রাচীরের পার্শ্বে মাটির প্রাচীর নির্মিত হ'ল। তার চারিপাশে পরিখা কাটা হ'ল। দুর্গের ভিতর সুশিক্ষিত সৈন্য স্থাপন করে, তা'দিগকে যথাযোগ্য পরামর্শ দিয়ে তিনি পাটনা ত্যাগ করলেন।

ইংরেজরা মুংগের থেকে পাটনাদুর্গের দিকে যাত্রা ক'রল। কঠোর প্রতিশোধের আকাংখা নিয়ে তারা অভিযান করল। কিন্তু পাটনায় তারা যখন পৌঁছল' তখন মীরকাশেম পাটনা থেকে সসৈন্যে প্রস্থান করেছেন, কিন্তু পাটনাদুর্গ বেশ সুরক্ষিত করে গিয়েছেন। তাঁরা প্রথমে কামান দেগে দুর্গ-প্রাচীরের দু'জায়গা ভেংগে ফেললেন। সেখান দিয়ে ইংরেজ সেনা দুর্গে প্রবেশ করল ; কিন্তু নবাব সেনাও বীরবিক্রমে বাধা দিতে লাগল। দলে দলে ইংরেজ সেনা প্রাণ দিতে লাগল তবুও তারা পশ্চাৎপদ হ'ল না। অনেক ক্ষতি স্বীকার করে তারা শেষ পর্যন্ত দুর্গ অধিকার করল'।

পাটনা-দুর্গের পতনের পর ইংরেজ সৈন্য মীরকাশেমের অনুসন্ধানে ধাবিত হ'ল। তারা উপস্থিত হ'ল রোটাশ দুর্গের দ্বারদেশে। সেখানে গিয়ে তারা শুন্‌ল যে, মীরকাশেম তাঁর

পরিবারবর্গকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে অন্যত্র নিয়ে গিয়েছেন। অবিলম্বে ইংরেজ সেনা রোটাশ দুর্গ পরিত্যাগ করে অগ্রসর হ'ল।

মীরকাশেম দেখলেন, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁর অন্য উপায় নাই। তিনি সেজন্য সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা ক'রে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌঁছে তিনি উত্তর পেলেন। সুজাউদ্দৌলা কোরাণের এক পৃষ্ঠায় তাঁকে আশ্রয় দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখেছেন, আর তাঁকে নিজরাজ্যে আহ্বান করেছেন। এতক্ষণে মীরকাশেমের হতাশ প্রাণে নবীন উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। আবার বুকে আশার আলো জ্বলে উঠল। আবার তিনি সাহসে বুকে বেঁধে ভাবতে লাগলেন, "স্বাধীনতার মূর্ত রবি কি আবার ভাস্বর হ'য়ে উঠবে না? বাঙালী কি আবার মুক্ত স্বাধীন আলোকে বাতাসে বিচরণ করবার সৌভাগ্য লাভ করবে না? নিশ্চয়ই করবে, আমার জীবন পণ রইল। ভগবান্! বাঙলার লোকের উপর তোমার কি এতটুকু আশীষ বর্ষিত হবে না?"

মীরকাশেম অবিলম্বে গংগা পার হ'য়ে এলাহাবাদে শিবির স্থাপন করলেন। অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে দিল্লীর বাদশাহের সহায়তা লাভ করবার জন্য তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। কারণ, বাদশাহ তখন অযোধ্যার নবাবের আশ্রয়ে লক্ষ্ণৌতে অবস্থান ক'রছিলেন।



অযোধ্যার নবাব ও বাদশাহের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন

অযোধ্যার নবাব স্নুজাউদ্দৌলা মীরকাশেমের আমন্ত্রণ পেয়ে মহা আড়ম্বরে এলাহাবাদে উপস্থিত হ'লেন। দ্বিগুণ আড়ম্বরে তাঁর অভ্যর্থনা হ'ল। মীরকাশেমের সৈন্যরা বহুদূর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় স্নুজাউদ্দৌলাকে অভিবাদন জানাল। দশ হাজার অশ্বারোহী সেনা সহ সুসজ্জিত পটমণ্ডপে প্রবেশ করে মহামূল্য সিংহাসনে তিনি উপবেশন করলেন। আদর আপ্যায়নের চূড়ান্ত হ'ল। স্নুজাউদ্দৌলা অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হ'য়ে মীরকাশেমকে আলিংগন ক'রে ধর্মভ্রাতা বলে সম্বোধন করলেন, আর তাঁকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর দুই নবাব সুসজ্জিত এক হাতীর পিঠে চড়ে বাদশাহের শিবিরে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা মহামূল্য উপহার দিয়ে পরস্পরকে আপ্যায়িত করলেন। এই ভাবে বাদশাহের সংগে দুই নবাবের মিলন হ'য়ে গেল।

এদিকে মীরজাফর সমস্ত সংবাদ অবগত হয়ে গোপনে স্নুজাউদ্দৌলার নিকট এক দূত প্রেরণ করলেন। মীরজাফর

বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—তিনিই বাঙলার প্রকৃত নবাব। তাঁর সৈন্য আছে, অর্থ আছে, সহায় সম্বল আছে ; আর মীরকাশেম রাজ্যভ্রষ্ট, বিতাড়িত সহায় সম্বলহীন। সুজাউদ্দৌলা খানিকটা বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। বাদশাহ স্থির করলেন যে, তিনি মীরজাফরকেই সমর্থন করবেন। কিন্তু মীরকাশেম নাছোড়বন্দা। তিনি নানা উপায়ে বহু অর্থব্যয়ে বাদশাহের অনুচরদিগকে হস্তগত করতে আরম্ভ করলেন। সুবর্ণের মোহ আর কতক্ষণ রোধ করা যায়—শেষ পর্যন্ত বাদশাহ মীরকাশেমের পক্ষই গ্রহণ করলেন। তখন কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের রাজা সুজাউদ্দৌলা ও বাদশাহের ঘোর বিরোধী। তাঁরা জিদ্ ধরে বসলেন যে, বুন্দেলখণ্ডের রাজা পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মীরকাশেমের সাহায্যে যুদ্ধযাত্রা করতে পারবেন না। কারণ, সুযোগ বুঝে বুন্দেলখণ্ডের রাজা হয়ত অযোধ্যা রাজ্য আক্রমণ করতে পারেন। মীরকাশেম দেখলেন, বড় বেশী দেরী হ'য়ে যায়—তাই তিনি স্বয়ং সসৈন্যে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করতে চাইলেন। বাদশাহ তাঁকেই সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। মীরকাশেম অনায়াসে বুন্দেলখণ্ড জয় সমাপ্ত করে ফিরে এলেন। এখন স্থির হল—অযোধ্যার নবাবের সেনাদল অবিলম্বে গংগা পার হ'য়ে বিহার আক্রমণ করবে, আর মীরকাশেম তাঁকে প্রতিমাসে এগার লক্ষ টাকা তন্‌খা দিবেন। আর বাঙলা বিহারের সিংহাসন লাভ করলে তিনি বাদশাহকে যথারীতি কর দিবেন। তদ্ব্যতীত মীরকাশেম আবশ্যক হ'লেই অযোধ্যার

নবাবকে সৈন্য সাহায্য করবেন। এই প্রকার সন্ধি স্থাপিত হ'য়ে গেল। নবাব সেনা বারাণসীর দিকে ধাবিত হ'ল।

—*—



নবাব সেনা বক্সারে এসে ছাউনি ফেল্‌ল। ইংরেজ সেনার অবস্থা তখন বড় ভাল ছিল না। এ্যাডাম্‌স্ সাহেব রণক্লান্তিতে ইতিপূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁর স্থলে মেজর কার্ণাক্ সেনাপতি নিযুক্ত হ'য়ে এসেছিলেন। তিনি বক্সার পর্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে রসদের অভাবে নবাব সেনাকে আক্রমণ করলেন না। অগণিত নবাব সেনার কলরবে ইংরেজ সেনা ভীত হ'য়ে উঠল, তারা পিছু হটে এসে পাটনায় পৌছল। তখন নবাব সেনা নির্বিবাদে পাটনা পর্যন্ত অগ্রসর হ'য়ে এসে ছাউনি ফেল্‌ল। এক মাসকাল নবাব সেনা ইংরেজদিগকে অবরুদ্ধ করে রাখল। কিন্তু জয় পরাজয় নির্ধারিত হ'ল না। একদিন সুজাউদ্দৌলা নবাব সেনা সহ ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করলেন। সেদিন ইংরেজদের অবস্থা বড় শোচনীয় হ'য়ে পড়েছিল। দেশীয় সৈন্যের বীরত্বেই ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের হাত থেকে

অব্যাহতি পেল। সেই কোম্পানীর আমল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত যুদ্ধেই ইংরেজ জিতেছে সিপাহী সেনার সাহায্যে। সিপাহী সেনার সাহায্য না পেলে একদিনের জন্যও ইংরেজ ভারতে স্থায়ী হ'তে পারত না, কিন্তু সেই সিপাহী সেনা চিরদিন তাদের কাছে লাঞ্ছিত ও অনাদৃত হ'য়ে এসেছে। তারা ইংরেজ সেনার চাইতে মাইনে পায় কম, তারা যে খাদ্যদ্রব্য পায় সে অতি কদর্য। অথচ বিপদের সময় তা'দিগকেই সবার আগে বুক পেতে দিতে হয়। দু'শত বছর ধরে ইংরেজের এই নীতিই চলে এসেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধেও সিপাহী সেনা এই রকম ব্যবহারই পেয়ে এসেছে। ১৯৪৬ সালে বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় নৌ-সৈন্য এই ব্যবহারে মর্মাহত হ'য়ে ধর্মঘট করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা ইংরেজ সেনাপতির অবাধ্য হ'য়ে উঠেছিল। তখন ইংরেজরা ভারতীয় নাবিকদের জাহাজে কামান দেগেছিল তা'তে অনেক ভারতীয় নাবিক নিহত ও আহত হ'য়েছিল।

ইংরেজের যুদ্ধজয় অধিকাংশ স্থলেই হ'য়েছে ভাগ্যের জোরে। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গত মহাযুদ্ধে ইংরেজ কোথাও যুদ্ধ করেনি, কেবল পশ্চাদপসরণ করেছে। মালয়ে, ব্রহ্মে, ফ্রান্সে, বেলজিয়মে, সর্বত্র ইংরেজ সৈন্য সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে,—আর সেই ইংরেজ শেষ পর্যন্ত হল রণ-বিজয়ী। বীর যোদ্ধাদের সব সময় জয় হয়, এমন কথা বলা যায় না। তা'হলে নেপোলিয়ন, মুসোলিনি, হিটলার, নেতাজী সুভাষের পতন হ'ত না।

ঠিক এই একই কারণে মীরকাশেম শেষযুদ্ধেও পরাজিত হ'য়েছেন। পাটনায় ইংরেজ সৈন্য অতি কষ্টে রক্ষা পেয়েছিল। তারপই এল দারুণ বর্ষা। অনন্যোপায় হ'য়ে নবাব সৈন্য বক্‌সারে গিয়ে শিবির স্থাপন ক'রল। ইংরেজরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ইংরেজরা সর্বত্র কুটিল কৌশলে বাজীমাৎ করেছে। ইংরেজ গভর্ণর বাদশাহকে লিখে পাঠলেন—"রাজ্যের যত রাজস্ব আর ধনদৌলত মীরকাশেম আত্মসাৎ করে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। সেইজন্য আপনি বাংলা-বিহারের রাজস্ব পাচ্ছেন না। অতএব তাঁর .কাছ থেকে ধনরত্ন উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেই আপনি প্রভূত ধনরত্ন পাবেন। আমরা আপনার সংগে সন্ধি করতে অত্যন্ত ব্যগ্র। তবে সমরু ও মীরকাশেমকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।" বাদশাহ ও অযোধ্যার নবাব রাজী হ'লেন না; অগত্যা ইংরেজরা সন্ধি করতে পারল না।

ইংরেজ দরবার মেজর কার্ণাককে বক্‌সারে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করতে বার বার আদেশ দিতে থাকলেন। কার্ণাক তখন ভয়ে জড়সড়। ইংরেজ সৈন্যদলে তখন বিদ্রোহ তার উপর খাদ্যদ্রব্যের অভাব। নবাব সৈন্যের বিক্রমের কথা কার্ণাক তখনও ভোলেননি। অতএব তিনি অগ্রসর হ'তে সংকোচ বোধ করছিলেন। এমন সময় মেজর মন্‌রো তাঁর স্থলে সেনাপতি হ'য়ে এলেন। কার্ণাককে বিদায় দেওয়া হল। মেজর মন্‌রো বর্ষাকালটা পাটনাতেই কাটালেন; সংগে সংগে যুদ্ধের আয়োজন চলতে লাগল।

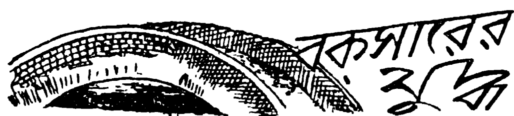
সুজাউদ্দৌলা মীরকাশেমকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়—স্বার্থের খাতিরে। মীরকাশেমের ভাণ্ডারে যতদিন অর্থ ছিল, ততদিন তিনি বাদশাহ, সুজা-উদ্দৌলা আর তাঁহাদের পাত্রমিত্র সকলকেই ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে রেখেছিলেন। যখন রাজকোষ শূন্য হ'য়ে এল, তখন সকলেই বিরূপ হ'য়ে উঠলেন। ভাণ্ডারে যা' অবশিষ্ট ছিল, কোষাধ্যক্ষ সেটী গ্রাস করে সুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয় নিল। চোরের আশ্রয়দাতা চোরকে আশ্রয় দেয়—অবশ্য কিছু মালের অংশ লাভের আশায়। সুজাউদ্দৌলার সে উদ্দেশ্য অপূর্ণ থাকল' না। বিচারের ভার যখন তাঁর উপর পড়ল, তিনি স্বচ্ছন্দে অসাধু কোষাধ্যক্ষের পক্ষ গ্রহণ করলেন। সেই সংগে, মীরকাশেম যে তাঁর সৈন্যদিগকে প্রতিশ্রুত টাকা দিতে পারেননি, তার জন্য সুজাউদ্দৌলা নবাবী চালে হতভাগ্য মীরকাশেমকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। দুর্দিনের আশ্রয়-দাতা যদি আশ্রিতকে দুর্বাক্য বলেন, তবে আশ্রিত আত্মহত্যা করে সব লাঞ্ছনা হ'তে মুক্তি পেতে চায়। মীরকাশেমও তাই অতি গভীর মর্মবেদনায় ছিন্নবস্ত্র পরে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। যাঁরা জীবনে কখনও দুর্দিনের যাত্রী হননি, তাঁরা এ দুঃখের গভীরতা বুঝতে পারবেন না। নবাব মীর-কাশেমের জীবনের শেষ অধ্যায় এমনিই অসহ্য দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়েই কাটতে লাগল।

অর্থের অভাবে তিনি সমরু ও তার সৈন্যদলকে বিদায় দিতে

বাধ্য হ'লেন। সংগে সংগে সমরুও সসৈন্যে সুজাউদ্দৌলার তাঁবুতে গিয়ে চাকরি নিলেন। এই সমরুর সৈন্যদলের সাহায্যে সুজাউদ্দৌলা মীরকাশেমের পটমণ্ডপ লুণ্ঠন করলেন। তাঁর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হ'ল—মহিলাদের ধনরত্নও বাদ গেল না। মীরকাশেম হ'লেন বন্দী।

এম্‌নি করে নবাব মীরকাশেমের দুঃখের ভরা পূর্ণ হ'য়ে গেল। তাঁর সমস্ত আশা-ভরসা বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। ইংরেজী সাহিত্যে একটা কথা আছে "বিপদ কখনও একা আসে না, সদলবলেই আসে।" মীরকাশেমের জীবনে সে কথাটী সম্পূর্ণ খাটে। এখন বাংলা-বিহারের নবাব মীরকাশেম বন্দী অবস্থায় কেবল মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণ্‌তে লাগলেন।

—*—



মেজর মন্‌রো ছিলেন প্রকৃত বীর সাহসী যোদ্ধা। তিনি পাটনা ত্যাগ করে বক্‌সারের দিকে ধাবিত হ'লেন। আরার কাছে পৌঁছেই ইংরেজ সৈন্য সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদলের দ্বারা বাধা পেল। সে বাধার সামনে ইংরেজ সৈন্য দাঁড়াতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করল। নবাব সৈন্য ইংরেজদিগকে বিশ্রাম না দিয়ে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করলে নিশ্চয় জয়লাভ ক'রত। কিন্তু হতভাগ্য নবাব সেদিন ইংরেজ সৈন্যের অনুসরণ করলেন না, শিবিরে ফিরে গেলেন। ইংরেজ-সৈন্য-হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রাত্রিতে সমরসভা বসল। সকলেই বুঝলেন—অবস্থা গুরুতর, ব্যাপার সংগীন, জয়ের আশা অতি অল্প। সে রাত্রিতে ইরেজদের ঘুম হয় নি। সকালে দেখা গেল—নবাব সেনা ইংরেজদের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। সুজাউদ্দৌলা নিজের তাঁবুতে ধনরত্ন ও মহিলাদিগকে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে চল্‌লেন। উভয় পক্ষ প্রাণপণে যুদ্ধ সুরু করল' কিন্তু যে কারণে ভারতীয়রা বিদেশীর কাছে প্রায়ই হেরে এসেছে, সে কারণে সুজাউদ্দৌলারও পরাজয় হ'য়ে গেল। যেই একজন মোগল সেনাপতি নিহত হ'ল, অমনি তার সৈন্যেরা তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিল। তারা

তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে গিয়ে নিজেদের তাঁবুতে লুণ্ঠন আরম্ভ করল। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! যারা তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিল, তারা ভাবল যে, তাঁবুতে তাদের ধনরত্ন লুণ্ঠিত হবে। ধনরত্ন রক্ষার জন্য তারাও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তাঁবুর দিকে ছুট্‌ল। তাতে যুদ্ধে হ'ল দারুণ বিশৃঙ্খলা, আর তার ফল হ'ল অনিবার্য পরাজয়। এই রকম করেই বীর নবাব সৈন্যদেরই শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। তখন সুজাউদ্দৌলা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরের দিকে দ্রুত ধাবিত হ'লেন। তিনি তাড়াতাড়ি ধনরত্ন নিয়ে সেতু পার হ'লেন। সেতু পার হবার পর তিনি সেতু ভাংবার আদেশ দিয়ে পলায়ন করলেন, ফলে বহু নবাব সৈন্য সেতু পার হ'তে পারল না। তারা ইংরেজ সৈন্যের কবলে পড়ল, আর শত্রু সৈন্যের সংগীনের খোঁচায় তাদের প্রাণ গেল।

এই যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে গোরা সৈন্য ছিল ৮৫৭ জন। তাদের মধ্যে হতাহত হ'য়েছিল ১৯১ জন, আর সিপাহী সৈন্য ছিল ৭০৭২ জন, তাদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ৬৮৫ জন। প্রকৃত পক্ষে সিপাহীরাই বুকের রক্ত দিয়ে ইংরেজদের বিজয় এনে দিয়েছিল।

যুদ্ধ প্রধানত হ'য়েছে সিপাহীর সঙ্গে সিপাহীর— আর জয় হ'য়েছে ইংরেজের। এই শোচনীয় ব্যাপার দু'শত বছরের উপর চলে এসেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে বাঙ্গালী, মারাঠী, শিখ, মুসলমানকে একে একে হারিয়েছে ভারতীয়

সিপাহীর বাহুবলেই। পলাশীর মাঠ থেকে আরম্ভ করে এই সেদিনের মণিপুরের যুদ্ধ পর্যন্ত সিপাহী সিপাহীর প্রাণ নিয়েছে। আর এই রকম করেই ইংরেজ হ'য়েছে ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করবার জন্য যেদিন ইংরেজ অগ্রসর হল, তখন জাপানীরা আসামে প্রবেশ করল। এক পক্ষ নামে ইংরেজ, আর এক পক্ষ নামে জাপানী। কিন্তু উভয় পক্ষে যুদ্ধ করেছে ভারতীয় সিপাহী। একপক্ষে বৃটিশ-চালিত ভারতীয় পল্টন, আর অন্যদিকে নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ভারতীয় মুক্তি-বাহিনী "আজদ-হিন্দ-ফৌজ"। আজাদ-হিন্দের সৈন্যরা সিংহবিক্রমে মণিপুরে প্রবেশ করে ভারতীয় ভূমি অধিকার করে নিল। তারাই ইম্ফল, কোহিমা প্রভৃতি রণক্ষেত্রে "চলো দিল্লী, দিল্লী চলো" বলে হুংকার করেছে আর বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার জন্য। অন্য দিকে বৃটিশের নিয়োজিত ভারতীয় সিপাহী এই মুক্তি সৈনিকদের উপর দারুণ আঘাত হেনেছে নির্বিচারে। একে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, যান-বাহন, আর খাদ্যের অভাব; তার ওপর বর্ষার প্রকোপে ও জাপানীদের আন্তরিকতার অভাবে তারা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম পায়নি। তাদের এরোপ্লেনও ছিল অতি কম। বৃটিশ এরোপ্লেনের বোমাবর্ষণে তারা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। তবু তারা খাদ্যের অভাবে ঘাস খেয়েও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। এত বড় বীরত্বের কাহিনী যাদের আছে, তারাও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হ'ল যুদ্ধ সরঞ্জামের

অভাবে। ভারতীয়দের হাতে ভারতীয়দের পরাজয় হল—বিশ্বে জয়বার্তা প্রচারিত হ'ল ইংরেজের।

মণিপুরে, ব্রহ্মদেশে যা ঘটেছে, বক্সারে অবিকল তাই ঘটেছিল।





বক্‌সারের যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সুজাউদ্দৌলা নিজরাজ্যে পলায়ন করলেন। মীরকাশেম যুদ্ধের পূর্বে সুজাউদ্দৌলার শিবির থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি খোঁড়া হাতীতে চড়ে কিছুদূর গিয়েছিলেন। যখন তিনি সুজাউদ্দৌলার পরাজয়ের কথা শুনলেন, তখন তিনি ভাবলেন—যে কোন অর্থলোভী দুর্বৃত্ত একলক্ষ টাকার লোভে তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে পারে। তাই তিনি হাতী ছেড়ে পদব্রজে বনপ্রদেশে প্রবেশ করলেন। কিছুদিন এখানে ওখানে আত্মগোপন করে থাকার পর তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হন। দিল্লীর নিকটে তাঁর শেষ জীবনটা অতি দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটেছিল। বংগ-বিহারের নবাবকে শেষ জীবন জীর্ণ কুঠীরে অনশনে অর্ধাশনে কাটাতে হ'য়েছিল। এই রকম করেই একদিন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করবার উপযোগী অর্থও ছিল না। তাঁরই পুরাতন শাল বিক্রয় করে সেই অর্থ দিয়ে

তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হ'য়েছিল। মীরকাশেমের দোষ ছিল অনেক। তিনি নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসী, আর অত্যাচারী, হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে দেশ ও জাতিকে বিদেশীর শাসন ও শোষণ থেকে রক্ষা করবার জন্য কঠোর দৃঢ়তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন, ইতিহাস তা' চিরদিন সাক্ষ্য দিবে। তাঁর নির্ভীক ব্যবহার, গভীর স্বদেশপ্রেম ভারতের অধিবাসীরা চিরকাল সাশ্রুলোচনে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করবে। মীরকাশেমের কার্যপ্রণালী সাফল্যমণ্ডিত হ'লে, ভারতের ইতিহাস অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করত।

———

